ক্লান্ত বিহঙ্গ

নীহার রঞ্জন গুপ্ত

॥ পরিবেশক ॥
॥ আধুনিক ॥ ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

কার্ত্তিক ১৩৭৯ সাল

প্রকাশক :

শ্রীদীপক দত্ত

১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রণ :

শ্রীরতিকান্ত ঘোষ

দি, সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

গনেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ইম্প্রেসন হাউস

কলিকাতা-৯

মূল্যঃ পাঁচ টাকা

উৎসর্গ

টুকুনকে

বাবা

২৬এ, গরিয়া হাট রোড
কলিকাতা-১৯

শ্যামল টাকাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে রইল।

ভুটানের বর্ডারে ছোট একটা জায়গা।

ছোট একটা বাজার—সেই বাজারের মধ্যেই সমীর ডাক্তারের ডিসপেনসারী।

ঐখানে বসার মাস খানেকের মধ্যেই ভুটানীদের মধ্যে সে তার প্র্যাকটিসটা জমিয়ে নিয়েছিল—নাম নিয়েছিল অর্জুন সিং—

তার আগে যে তিন জায়গায় ডেরা বেঁধেছে সব ডেরা তার ভেঙ্গে গিয়েছে—

সেদিন সন্ধ্যায়—সমীর তার ডিসপেনসারীতে বসে আছে—প্রচণ্ড শীত বাইরে—পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফ। বর্ডার ফোর্সের একজন ইনটেলিজেণ্ট অফিসার ক্যাঃ সানজানা এসে ঘরে ঢুকল—

গুড ইভনিং ডঃ সিং—

গুড ইভনিং—বোস ক্যাঃ, এই শীতের মধ্যে ক্যাম্প থেকে বের হয়েছো—

কি করি বলো—কাল একটা ম্যাসেজ এসেছে—একজন absconder নাকি এই তল্লাটে এসে ডেরা বেঁধেছে—

সেকি!

আর বল কেন—মার্ডারার—অথচ লোকটা শুনেছি একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার—

কফি করে আনি—

কফি! মন্দ নয়—

রাম খাবে? রাম আছে বিলেতী রাম—

সত্যি—

হ্যাঁ—তবে তাই আনো।

একটা রামের বোতল এনে পাশে রাখল সমীর, ক্যাঃ সানজানা ড্রিংক করতে শুরু করে—বোস মাটন আছে রোস্ট করে আনি।

বোতল দিয়ে বসিয়ে রেখে ক্যাঃকে সমীর সোজা এসে তার ঘরে ঢুকে গায়ে ওভার কোটটা চাপাল তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ক্যাঃয়ের জীপে উঠে বসে জীপটা চালিয়ে দিল—

পাহাড়ী পথ ধরে অন্ধকারে হেড লাইট জ্বালিয়ে জীপ চালাতে লাগল সমীর।

ঐ ঘটনারই দিন পনের পরে—

রাত—সন্ধ্যা রাত সাড়ে সাতটা। মধ্যপ্রদেশের একটা পুলিশ স্টেশন। শীতের রাত।

সিগন্যাল মেসেজ—

হ্যালো হ্যালো হ্যালো—নট থ্রি ফাইভ্—

থানা অফিসার বলদেব দেশাই ফোনটা কানে লাগিয়ে মেসেজ নেন। মেসেজটা নিতে নিতে দেশাইয়ের কানটা খাড়া হয়ে ওঠে।

ছোট মেসেজ কিন্তু মারাত্মক।

ভুটান থেকে পলাতক অ্যাব্স্কনডার ডাঃ সমীর চৌধুরীকে নাকি ঐ তল্লাটে দেখা গিয়েছে। সে হাঁটাপথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছে। কয়েকজন আদিবাসী জঙ্গলে কাঠ কুড়োচ্ছিল—তাকে যেতে দেখেছে।

পরনে ট্রাউজার—একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে—মাথায় একটা মিলিটারী টুপি।

কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না আজ দেড়টা বছর আপ্রাণ চেষ্টা করেও লোকটাকে।

কখনো পশ্চিমবঙ্গে কখনো উত্তরবঙ্গে—কখনো উত্তরপ্রদেশে কখনো মহারাষ্ট্রে—কখনো মহীশূরে কখনো দক্ষিণ ভারতে—কখনো ভুটানে—মানুষটা যেন এই আছে ত এই নেই।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পুলিশবাহিনী লোকটার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না।

খুনী আসামী ডাঃ সমীর চৌধুরী।

কলকাতা শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র জয়ন্ত বোসকে হত্যা করে গত দেড় বছর ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মানুষটা বেড়াচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে ধরবার ভার পড়েছে সেন্ট্রালের সুদক্ষ অফিসার মিঃ চন্দন সিংয়ের উপরে।

মধ্যপ্রদেশের একটা পুলিশ স্টেশন।

তারই অফিসার বলদেব দেশাই।

মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলদেব দেশাই উঠে পড়লেন। একটু মোটা মানুষ—তাহলে কি হবে খুব ক্ষিপ্র এবং কর্মঠ! বয়স চল্লিশের কিছু উপরে।

থানাটা যেখানে অবস্থিত তারই মাইল দুয়েকের মধ্যে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। দুজন বন্দুকধারী সেপাই নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলদেব দেশাই বের হয়ে পড়লেন।

জীপ সরু রাস্তা ধরে জঙ্গলের দিকে ছুটে চলল।

কয়দিন থেকেই প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

হাড়কাঁপানো শীত।

কিন্তু উপায় কি, যেতেই হবে, জরুরী মেসেজ!

শীতের রাত—তার উপরে বেশ অন্ধকার।

জঙ্গলের মুখেই ইনফরমার দাঁড়িয়েছিল—সে বললে, লোকটার ডান পাটা বোধহয় জখম হয়েছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাকে ঘণ্টাখানেক আগে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পূব থেকে পশ্চিম মুখে যেতে দেখা গিয়েছে।

দেশাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন—

কিন্তু জীপ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বেশীদূর এগুল না। মাইলখানেক গিয়েই জীপ থেকে ওরা নেমে পড়ল। ঘন অন্ধকার চারিদিকে।

এবারে টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেশাই অগ্রসর হলেন।

লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এবং লক্ষ্যভেদে সে নাকি অব্যর্থ।

রাত্রির জঙ্গলে বিচিত্র সব শব্দ।

কিন্তু উপায় নেই যেতেই হবে!

ডালপালা কাঁটাঝোপ—দু-পা এগোয় ত তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়।

শালার পুলিশের চাকরির নিকুচি করেছে—মনে মনে গজরাতে থাকে বলদেব দেশাই। হাতের জোরালো টর্চের আলো ফেলে ফেলে সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হচ্ছে—

আগে দুজন সেপাই—

পিছনে বলদেব দেশাই।

ও শালা ভাগ্ গিয়া হুজুর, একজন সেপাই বলে।

অন্যজন মন্তব্য করে, এহি আঁধারী মে ঢুড়না বেফায়দা হ্যায় হুজুর—

বলদেব খিঁচিয়ে ওঠে, বকো মাত্ আগে বাঢ়—

ওরা যখন জঙ্গলের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে ফেলে সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে—

তখন জঙ্গলের অন্যপ্রান্তে যে জোড়া রেল লাইন—সেই রেল লাইন ধরে একটা আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন দূরে রেড্ সিগন্যাল দেখে ধীরে ধীরে থেমে গেল।

জঙ্গলের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে কে একজন ট্রেনের কাছাকাছি আসতেই ট্রেনটা তখন সিগন্যাল ডাউন পেয়ে আবার চলতে শুরু করেছে—কোনক্রমে চলন্ত ট্রেনের একটা হাতল ধরে সেই লোকটি ট্রেনের পাদানীতে উঠে পড়ল।

ট্রেনটা স্পীড্ নেয়।

শীতের রাত—কনকনে হাওয়া দিচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখলো ও—সমস্ত কামরার মধ্যে বসে জনা দুই যাত্রী—চুপচাপ চাদর মুড়ি দিয়ে

শীতে বসে আছে—কি যেন ভাবলো লোকটি তারপরে দরজার লকটা ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল—

খোলা দরজা পথে ভিতরে পা দিল—যাত্রীরা তাকালও না ওর দিকে।

৭

রাত দশটা প্রায়।

ছোট একটি রেল স্টেশন।

ছোট প্ল্যাটফরম—স্টেশন মাষ্টারের ঘর—একটি ওয়েটিং রুম ও একটি গোডাউন।

ছোট হলেও স্টেশনটির গুরুত্ব আছে। কিছুদূরে জঙ্গল থেকে কাঠ চালানের ব্যাপারে।

স্টেশন মাষ্টার শান্তাপ্রসাদ অনুপস্থিত—পয়েন্টস্‌ম্যান বংশীলালই স্টেশনের ডিউটি করছে—সেই স্টেশন মাষ্টার—সেই গেটকীপার—সেই পয়েন্টস্‌ম্যান—অবিশ্যি আরো একজন আছে সিগন্যালম্যান কামতাপ্রসাদ।

স্টেশন মাষ্টার শান্তাপ্রসাদের বয়েস হয়েছে—রিটায়ার করবার আর বৎসরখানেক আছে। শান্তশিষ্ট গোবেচারা মানুষ।

স্ত্রী অনেকদিনই গত হয়েছে—একমাত্র বন্ধন ছিল কন্যা যমুনা—যমুনাকে লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন।

শহরে থেকে সে কলেজে পড়ত।

চমৎকার দেখতে যমুনা—গানের গলা ছিল অদ্ভুত মিষ্টি। গান-বাজনার শখও ছিল—এবং নিজেই চেষ্টা করে গানবাজনা শেখে।

শেষ পর্যন্ত ঐ গানবাজনার শখই তার জীবনে আনল চরম এক অভিশাপ।

এক তরুণ গায়কের প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেছিল যমুনা শান্তাপ্রসাদের অজান্তেই—

একমাত্র মাতৃহারা কন্যা যমুনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন শান্তাপ্রসাদ—যখন বিবাহের ব্যাপারটা জানতে পারলেন মনে দুঃখ পেলেন প্রচণ্ড কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বৎসর খানেক বাদে সংবাদ পেলেন শান্তাপ্রসাদ যমুনাকে ফেলে তার স্বামী যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে বোম্বাই সহর থেকে।

সংবাদ পেয়ে শান্তাপ্রসাদ ছুটে গেলেন—যমুনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন নিজের কাছে।

প্রথমটায় যমুনা কিছুতেই বাপের সঙ্গে আসতে চায়নি।

যমুনা তখন অন্তঃসত্ত্বা।

কিন্তু কলহাসিনী সদা আনন্দমুখরা যমুনা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

সে কথা বলে না, হাসে না—গান গায় না, শান্তাপ্রসাদ খোঁজ করতে লাগলেন যমুনার স্বামীর কিন্তু কোন খোঁজ পেলেন না।

কিছুদিন বাদে যমুনার একটি পুত্রসন্তান হলো—সন্তান জন্মের আগে থাকতেই যমুনার কিছু কিছু মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দিয়েছিল—পরে সে একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেল।

বিকৃতমস্তিষ্ক হলেও যমুনা ভায়োলেণ্ট কখনো হয়নি।

দিনরাত বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বেশীর ভাগ সময় দিনে রাত্রে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াত—মধ্যে মধ্যে কখন বাড়িতে আসত। নিজের সন্তানটির প্রতি কোন দৃষ্টি ছিল না—কোন আকর্ষণ বা মমতাও ছিল না।

প্রৌঢ় শান্তাপ্রসাদই বুকে করে যমুনার সন্তানটিকে আগলে বেড়াতেন যেন।

যমুনার আর একটা বিচিত্র নেশা ছিল—রাত্রে সে স্টেশনের আশে পাশেই ঘুরে বেড়াত এবং কোন ট্রেন এলে ছুটে যেত—

শান্তাপ্রসাদও মেয়েকে মধ্যে মধ্যে ধরে ধরে আনতেন কিন্তু সে

আবার ঘর ছেড়ে চলে যেত—শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন শান্তাপ্রাসাদ।

তারপর আট বছর কেটে গিয়েছে।

যমুনার সন্তান বাবুয়াকে নিয়েই শান্তাপ্রসাদ কন্যার বিকৃত মস্তিষ্কের দুঃখটা যেন ভুলে ছিলেন।

এমনি করে আটটা বছর চলে গিয়েছে।

আজো যমুনা ছিন্ন মলিন বসন—একমাথা রুক্ষ চুল—বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়ায়।

সবাই চেনে ও তল্লাটে শান্তাপ্রসাদের বিকৃতমস্তিষ্ক মেয়ে যমুনাকে।

যে রাত্রির কথা বলচি—

শান্তাপ্রসাদের নাতি বাবুয়ার আজ কয়দিন ধরে জ্বর চলছিল এক নাগাড়ে।

স্থানীয় ডাক্তার যুগলকিশোরই দেখছেন বাবুয়াকে। কিন্তু যুগল-কিশোর মানুষটা একটি অর্থপিশাচ—

স্থানীয় বলতে ঠিক স্থানীয় নয়—মাইল দুয়েক দূরে ছোট্ট শহরটিতে থাকেন যুগলকিশোর।

একটি টমটম আছে—তাতেই চড়ে এখানে ওখানে আশে পাশে রুগী দেখে বেড়ান।

আগেকার দিনের স্কুলের পাস।

বাবুয়ার জ্বরটা দুপুর থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে—বিকেলের দিকে বংশীলালকে পাঠিয়েছিলেন শান্তাপ্রসাদ বাবুয়াকে একবার এসে দেখে যাবার জন্য কিন্তু যুগলকিশোর আসেননি।

বলেছেন পরের দিন সকালে যাব। যে ঔষধ চলছে সেই ঔষধই চলুক।

নাতিকে আগলে শান্তাপ্রসাদকে বসে থাকতে হয়েছে—বংশীলালকে বিকেলের দিকে স্টেশন থেকে চলে আসবার সময়

বলেছিলেন শান্তাপ্রসাদ, বংশী আমি আজ আর রাত্রে স্টেশনে আসব না—রাত পৌনে দশটার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা পাস করিয়ে দিও—

বংশীলাল বলেছিল, ঠিক হ্যায় মাস্টারজী, আপ যাইয়ে—স্টেশনকা কামকা লিয়ে আপ্ ফিকার না করিয়ে—ম্যায় সব সামহালুঙ্গা—

স্টেশনের অল্প দূরে স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার।

অগর কিসিকা জরুরত হোয়ত মুঝে খবর দেনা—সমঝা!

জী।

অবিশ্যি শান্তাপ্রসাদ ভাল করেই জানতেন রাত্রে তার কোন বিশেষ প্রয়োজন হবে না।

ছোট স্টেশন—দিনের বেলা গোটা দুই আপ ও ডাউন ট্রেন যাতায়াত করে—রাত্রে দশটা নাগাদ একটি আপ ট্রেন যায়।

তাতেও যাত্রী বড় একটা থাকে না বেশীর ভাগ দিনই।

বংশীলাল ঘড়িতে দেখল ডাউন ট্রেনটা আসার প্রায় সময় হয়েছে—বাইরে বের হয়ে কামতাপ্রসাদকে ডেকে সিগন্যাল ডাউন দিতে বললে।

শীতের রাত—

বাইরে বেশ কনকনে শীত।

ট্রেনের শব্দ আসছে দূর থেকে—এতক্ষণে বোধহয় ট্রেনটা এসে পড়ল।

একটা কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে সবুজ আলোটা হাতে বংশীলাল স্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

প্ল্যাটফরমত ঠিক নয়—বরাবর খানিকটা লাইনের পাশে পাশে সুরকী পেটান বাঁধানো জায়গা।

সর্বসাকুল্যে গোটা চারেক আলোর ব্যবস্থা সমস্ত প্ল্যাটফরমটায়—তাও কেরোসিনের বাতি ভিতরে এবং বাইরের চিমনির যে অবস্থা—ঝাপসা একটা আলো আঁধারীর সৃষ্টি করেছে মাত্র। নতুন ইলেট্রিকের ব্যবস্থা হচ্ছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

দূরে ওভার ব্রীজটা দেখা যায়।

স্টেশন প্ল্যাটফরমে একটিই পান সিগারেট ও খাবারের দোকান হরিরামের—তা শীতের জন্য সেও সন্ধ্যার পর পরই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গিয়েছে।

খাঁ-খাঁ করছে স্টেশনটা।

দূরে গাড়ির আলো দেখা গেল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন—কোন যাত্রী নেই—হয়ত ট্রেন থেকেও কোন যাত্রী নামবে না বংশীলাল জানে তবু ডিউটি দিতে হবে।

গাড়িটা পাস করিয়ে দিতে পারলেই রাতের মত ছুটি—কাল সকাল ছটার পরে সেই প্রথম ট্রেন।

গাড়িটা এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল ধীরে ধীরে একসময়।

বংশীলাল ভেবেছিল যাত্রী থাকবে না কিন্তু দেখা গেল দুজন যাত্রী এগিয়ে আসছে—

কাছে আসতেই দেখল একটি তরুণী ও অন্যজন যাত্রী নয়—টি. টি. আই.

তরুণীকে দেখলে অভিজাত ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়।

পাতলা চেহারা—হাতে সোনার চুড়ি—পরনে একটি দামী সিল্কের শাড়ি।

গায়ে জড়ানো একটা দামী শাদা শাল।

পায়ে চপ্পল।

কাঁধে ঝোলান একটা হ্যাণ্ডব্যাগও।

টি. টি. আই. এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্টেশন মাস্টার কোথায়?

কেন? কি দরকার তাঁকে? বংশীলাল শুধায়।

এই মেয়েটি বিনা টিকিটে ট্রাভল করছিল—একে জি. আর. পি.র হাতে তুলে দিতে হবে—

গার্ড ইতিমধ্যে সবুজ আলো দেখিয়েছে—

বংশীলাল সত্য সংবাদটা ভাঙ্গল না। বললে, ঠিক আছে আপনি যান—স্টেশন মাস্টার ঘরে আছে, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

সত্যি কথাটা বলল না বংশীলাল টি. টি. আই.কে যে স্টেশন মাস্টার কোয়ার্টারে।

টি. টি. আই. আর দাঁড়াল না। ট্রেনও ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল—এক লাফে চলতি গাড়ির একটা কামরার হ্যাণ্ডল ধরে উঠে পড়ল।

ট্রেনটা চলে গেল।

স্টেশনটা আবার খাঁ-খাঁ করে।

বংশীলালের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী হবে না। একাই থাকে ও এখানে। দেশে স্ত্রী ও তুই মেয়ে।

বংশীলাল শুধাল, বিনা টিকিটে যাচ্ছিলেন কেন?

মেয়েটি কোন জবাব দেয় না।

কোথা থেকে আসচেন? বংশীলাল আবার জিজ্ঞাসা করে।

বোম্বাই থেকে—মেয়েটি এবারে বললে।

কোথায় যাবেন?

কলকাতা—

কিন্তু এ ট্রেন ত কলকাতায় যায় না—এ ত নাগপুর থেকে অন্য লাইনে যাবে—তা যেখানেই যান টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠেছিলেন কেন?

মেয়েটি এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

বংশীলাল যেন কি ভাবল, তারপর বললে, কলকাতায় যাবার ট্রেন ত কাল বিকেল চারটার পর—ঐ একটা ট্রেনই কলকাতায় যায়—

তাহলে?

তাইত জিজ্ঞাসা করচি এখানে ত কাউকে চেনেনও না আপনি—

না—কেমন করে চিনবো—

তা ঠিক—তবে আর টাকা পাবেন কোথায়? টিকিটের দামটা দিলে স্টেশন মাস্টার শান্তাপ্রসাদ হয়ত আপনাকে ছেড়ে দিত—

মেয়েটি কোন জবাব দেয় না।

চলিয়ে রাত মে ওয়েটিং রুম মে ঠারিয়ে—কাল সুবে স্টেশন মাস্টার আয়েগা তব্ ফ্যায়সলা হোগা।

তরুণী বংশীলালের কথায় এবারও কোন জবাব দিল না।

বংশীলাল এগিয়ে যায় লণ্ঠনটা হাতে—

তরুণী তার পিছনে পিছনে চলে।

বংশীলালের কুর্তার পকেটেই ওয়েটিং রুমের চাবিটা ছিল—

কোচড় থেকে চাবীর গোছা বের করে হাতের লণ্ঠনটা একপাশে নামিয়ে রেখে বংশীলাল চাবী ঘুরিয়ে তালাটা খুললো।

ঠেলে দরজার কবাট দুটো খুলতেই অন্ধকার ওয়েটিং রুম থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বদ্ধ বাতাসে ভেসে এলো।

ঠারিয়ে—বাত্তি জ্বালানে দিজিয়ে—

বংশীলালই আগে আগে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

একটু পরে ফস্ করে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানর শব্দ শোনা গেল।

ওয়েটিং রুমের মাঝখানে যে ডিম্বাকৃতি বড় গোল টেবিলটা ছিল সেটার উপরেই বাতিটা ছিল।

আলো জ্বালালো বংশীলাল।

আইয়ে ভিতর—

বংশীলালের আহ্বানে তরুণী ভিতরে প্রবেশ করল।

অপরিষ্কার চিমনি—কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে। আলো যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা। সেই ঝাপসা ঝাপসা আলোতেই মেয়েটি দেখল ছোট একটি ঘর।

দু'পাশে দুটো বেঞ্চ পাতা—ছোট একটি টেবিল, খান দুই চেয়ার —ব্যস্ আর কোন আসবাবপত্র নেই—

জানালা দুটো—কাচের সার্সী লাগান—বন্ধ।

লাগোয়া বাথরুমও একটা আছে।

কাঠের ব্যবসায়ীরা এপথে যাতায়াত করার সময় মধ্যে মধ্যে দু'এক ঘণ্টা বসে বলে ঐ ওয়েটিং রুমটির ব্যবস্থা।

বাইরের কনকনে শীত থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেন বেশ আরামই বোধ হয় তরুণীর।

থাকুন আপনি—দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবেন—ভয়ের কিছু নেই—বাইরেই সিগন্যালার গোডাউনের দরজায় শুয়ে থাকে, আর আমিও থাকব স্টেশন ঘরে।

তরুণী কোন জবাব দেয় না।

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকায়।

বংশীলাল আবার বলে, কাল সকালে স্টেশন মাস্টার এলে আপনার ব্যবস্থা হবে—

বংশীলাল আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল দরজার কবাট দুটো টেনে দিয়ে বাইরে থেকে।

তরুণী আবার দরজার দিকে তাকাল ঘরের ঝাপসা আলোয়।

উঃ, কি বিপদেই পড়া গেল!

টিকিট কেটে যদি ট্রেনে উঠতো তবে ত ঐ বিভ্রাট হতো না। কিন্তু টিকিট কাটবে কি—ও তখন ভাবছে বাড়িতে নিশ্চয়ই ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গিয়েছে—ব্যান্দ্রার বাড়িতে তাদের হইচই পড়ে গিয়েছে।

চারিদিকে টেলিফোনের পর টেলিফোন।

কোনমতে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়েই সুড়ুৎ করে গেট পাস করে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়েছিল।

সামনেই একটা ট্রেন তখন ছাড়ছে—সেই ট্রেনটাতেই উঠে পড়েছিল। ট্রেনটা প্ল্যাটফরম ছাড়াবার পর তার নিশ্চিন্তি।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতে গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢোকার সময় কখন যে কে তার হাতের ব্যাগটা কোন ধারাল অস্ত্রের

সাহায্যে ফাঁসিয়ে তার ব্যাগটা একেবারে খালি করে দিয়েছে জানতেও পারেনি—জানতে পারল গোটা সাতেক স্টেশনের পর রাত্রি নয়টা নাগাদ চেকার এসে টিকিট চাইতে।

টিকিট কাটতে পারেনি তাড়াহুড়াতে—টাকা দিচ্ছে সে। কিন্তু ব্যাগ খুলতে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাগ ফাঁকা।

টি. টি. আই. বিশ্বাসই করল না তার কথা। মাঝপথে এইখানে নামিয়ে দিল।

তাড়াহুড়াতে বেশী আনতে পারেনি—ব্যাগে শ'চারেক মাত্র টাকা নিয়ে এসেছিল।

না—এখন আর ভেবে কি হবে।

রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। অবিশ্যি একা একা রাতটা এই নির্জন স্টেশনের এক ওয়েটিং রুমে কাটাতে হবে বলে তার কোন ভয় করছে না।

ঐ লোকটা ভাল। মনে হলো দয়ামায়া আছে। ওকেই কাল সকালে ধরতে হবে একটা ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু স্টেশন মাস্টার লোকটা, সে যদি তাকে না ছাড়ে—শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতেই তুলে দেয়।

দূর ছাই—ভেবে কোন লাভ নেই, যা হবার হবে। রাতটা এখানে যখন কাটাতেই হবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া ভাল।

ঘুম হবে না ঠিকই, তবু ত এই অচেনা অজানা জায়গায় ঘরের মধ্যে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

এগিয়ে গেল তরুণী দরজার ছিটকানিটা তুলে দেবার জন্য—তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা যেন বিশ্রী অস্পষ্ট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওর কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি—

বাথরুমের দরজাটা—

হ্যাঁ—ঐ ত বাথরুমের দরজাটাই খুলে যাচ্ছে—কেমন যেন একটা বিস্ময়-আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টিতে দরজাটার দিকে তরুণী রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইল। দরজাটা খুলে যাচ্ছে—

॥ দুই ॥

খোলা দরজাপথে একটা মুখ।

মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

কে? Who are you?

ভয়ার্ত চাপা একটা চিৎকার যেন বের হয়ে আসল তরুণীর কণ্ঠ হতে ওর অজ্ঞাতেই।

ততক্ষণে বত্রিশ তেত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ বলিষ্ঠকায় এক যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বাথরুমের দরজা খুলে।

তাড়াতাড়ি সে ঠোঁটে আঙ্গুল তুলে চাপা গলায় হিন্দীতে বললে—উহুঁ। চেঁচাবেন না—আর চেঁচাবার যদি ফের চেষ্টা করেন, দু'পা এগিয়ে এলো আগন্তুক—গলাটা টিপে ধরবো—

তরুণী হঠাৎ যেন কেমন থমকে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়টা তখন বুঝি তার কাটেনি। চেয়ে আছে নিঃশব্দে আগন্তুকের দিকে।

পরনে আগন্তুকের মলিন একটা ট্রাউজার—গায়ে গলাবন্ধ কোট—মাথায় একটা মিলিটারী বেরে ক্যাপ।

যান, বসুন গিয়ে ঐ বেঞ্চটায়—

তরুণী তখনো আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে।

বৈঠিয়ে—যাইয়ে আরামসে বৈঠিয়ে—ডরিয়ে মাত্—

কৌন হো তুম? এতক্ষণে মেয়েটির গলার স্বর ফুটল যেন।

ম্যায়—

হাঁ—কৌন হো তুম—কে—কে আপনি?

বাঃ আপনি বাঙ্গালী দেখছি—বলে ওঠে আগন্তুক। আমিও বাঙ্গালী—আগন্তুক যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিল।

তরুণী ততক্ষণে নিজের সাহস যেন কিছুটা ফিরে পেয়েছে—আর বুঝতেই ত পারছিল এ সময় নার্ভ হারানো কোন কাজের কথা নয়।

প্রশ্ন করল তাই আবার, লেকেন কৌন হো তুম্—এ কামরামে ঘুসা কেইসে?

আমি? আমি মনে করুন না আপনারই মত একজন যাত্রী। যে ট্রেনটা থেকে আপনি নেমেছেন একটু আগে আমিও ঐ ট্রেনেরই যাত্রী—just আপনার ঠিক আগেই এঘরে ঢুকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—

মিথ্যে কথা! মেয়েটি বললে। যেন প্রতিবাদ জানাল।

মিথ্যে কথা? কেন—মিথ্যে কথা কেন?

হ্যাঁ, ঝুট্—এঘরের দরজা ত এতক্ষণ বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল—

তা ছিল তবে—হঠাৎ একটু হেসে বললে আগন্তুক, ঐ যে বাথরুমটা—ওর ভিতরে পিছনদিকে মেথরদের যাতায়াতের জন্য একটা দরজা আছে—সেটা খোলাই ছিল—

মিথ্যে কথা—আপনি ঐ বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন নিশ্চয়ই।

লুকিয়ে—লুকিয়ে থাকতে যাবো কেন—যুবক এবারে হেসে ফেললে।

আপনি মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই—

চোর না হয় একটা ডাকাত, তাই না—বেশ—তা যদি হইই আপনার ত ভয়ের কোন কারণ নেই—আপনার কাছে ত বোধহয় একটা ফুটো পয়সাও নেই—তাহলে নিশ্চয়ই অন্তত টিকিটের টাকাটা দিয়ে দিতেন—

দিতামই ত—ব্যাগটা কে যেন কেটে সব টাকা—

যুবক আবার হেসে বললে, কেটে নিয়েছে বুঝি ব্যাগ—ঠিক আছে বিশ্রাম করুন—তবে বিশ্বাস করুন আমি নয় কিন্তু—

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় মেয়েটি যুবকের দিকে—

অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? বিশ্বাস না হয় সার্চ করে দেখতে পারেন।

আপনি বেরিয়ে যান এঘর থেকে।

ঐ বাথরুমের ভিতর দিয়ে—বিশ্বাস করুন ভীষণ নোংরা—দুর্গন্ধে এতক্ষণ দম আটকে ছিলাম—

আমি ঐ দরজা খুলে দিচ্ছি বের হয়ে যান।

সেটা কি ভাল হবে ম্যাডাম্, যুবক আবার হাসলো, তাছাড়া বেশীক্ষণ আমি থাকবোও না হয়ত, যতক্ষণ থাকবো—সে সময়ের জন্য আসুন না পরস্পরের মধ্যে একটা Pact করা যাক।

প্যাক্ট্—

হ্যাঁ—এসে যখন দুজনেই আমরা একই সময় একই ওয়েটিং রুমে পড়েছি—একটা রাত ত—তা আপনি ঐ বেঞ্চটায় থাকুন আর আমি এই বেঞ্চটায়—

না—

না?

না—এঘরে আপনি থাকতে পারবেন না—I won't allow you—

দেখুন—আমার পরিচয় যাই হোক না কেন, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন আপনার প্রতি কোন রকম—

আপনি যাবেন কি না জানতে চাই!

আপনি দেখচি অত্যন্ত সিরিয়াস!

যাবেন—না আমি কাউকে চেঁচিয়ে ডাকব?

আচ্ছা ম্যাডাম আপনি অত হিস্টিরিক হচ্ছেন কেন বলুন ত। আপনি না হয় উইদাউট টিকেটে ট্রাভ্ল্ করার জন্য এঘরে ঢুকতে বাধ্য হয়েছেন আর আমি না হয় এই শীতের রাত্রে জঙ্গলে না থেকে ওয়েটিং রুমটা খালি পাবো ভেবে ঢুকে পড়েচি অনন্যোপায় হয়েই—ভেবে দেখতে গেলে ত দুজনাই আমরা—

আপনি যদি এই মুহূর্তে এই ঘর থেকে বের হয়ে না যান ত—

চেঁচিয়ে লোক ডাকবেন—তা ডাকুন—আমাকে না হয় হদ্দমদ্দ এই ঘর থেকে বের করে দেবে কিন্তু আপনার আসল ব্যাপারটা যখন জানতে পারবে তখন আপনাকে—

আসল ব্যাপার মানে ?

মানে আর কি এই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেচেন—

পালিয়ে এসেচি মানে—ভ্রূ কুঁচকে তাকাল আগন্তুকের দিকে তরুণীটি।

মানে তাই ত মনে হচ্ছে—ঐ পরনের জামাকাপড়—হাতের সোনার চুড়ি—

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মেয়েটি যুবকটির দিকে। যুবকটি মিটিমিটি হাসছে।

আর তা যদি না হয় ত—

যুবকটির কথা শেষ হলো না। সহসা একটা হাওয়ার ঝাপটায় একটা জানালার কাচের একটা পাল্লা শব্দ করে খুলে গেল, আর সেই সঙ্গেই শোনা গেল বাইরে অদূরে কোথায় একটা বন্যজন্তুর ডাক—

তরুণী তাড়াতাড়ি কয়েক পা যুবকের দিকে এগিয়ে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, ও—ও কিসের ডাক ?

সম্ভবত বাঘ—একান্ত নির্বিকার কণ্ঠে যুবকটি জবাব দিল।

বাঘ! আরো দু'পা এগিয়ে আসে তরুণী, যুবকের দিকে।

যুবকটি আবার নির্বিকার কণ্ঠেই যেন জবাব দিল, আছে বলেই ত শুনেছি—আশেপাশে যে রকম জঙ্গল—লোকে এখানে বাঘ শিকার করতে আসে।

তরুণী আরো দু'পা ততক্ষণে যুবকটির কাছে এগিয়ে এসেছে। যুবকটি বুঝতে পারে তরুণীর গলার স্বরেই সে ভয় পেয়েছে।

সত্যি এখানে বাঘ আছে নাকি ?

খুব জঙ্গল ?

হ্যাঁ—আশেপাশে ঘন জঙ্গল—

জানালার খোলা পাল্লাটা হাওয়ায় আবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে খোলে ও বন্ধ হয়—

যুবকটি ততক্ষণে জানালার অপর দিকে যে বেঞ্চটা ছিল তার উপরে গিয়ে আরাম করে বসে পড়েছে।

তরুণী এগিয়ে গিয়ে যুবকটি যে বেঞ্চে বসেছিল সেই বেঞ্চেই বসে পড়ল।

জানালাটা—তরুণী যেন কেমন বোজা গলায় বললে—

কি হয়েছে ? পকেট থেকে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল যুবক—

বন্ধ করে দিলে হতো না জানালাটা—

তা হতো তবে মনে হচ্ছে ওটা বন্ধ করলেও হয়ত বন্ধ হবে না—

বন্ধ হবে না—কেন ?

বোধহয় জানালার ছিটকিনি নেই—

তরুণী জানালার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে আরো একটু পাশে ঘেঁষে বসে যুবকের। খোলা জানালাপথে নানা ধরনের বিচিত্র শব্দ ও ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসে ঘরের মধ্যে।

কিছুক্ষণ তুজনাই চুপ চাপ—তরুণী চুপ চাপ বসে ঘন ঘন খোলা জানালা পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছে আর যুবকটি নির্বিকার বসে বসে সিগ্রেট টানছে।

হঠাৎ একটি মুখ জানালাপথে দেখা গেল। একটি নারীর মুখ —বয়স ত্রিশ বত্রিশের মধ্যে হবে—মাথার চুল এলোমেলো। তরুণীর সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই সব ভুলে গিয়ে ভয়ে যুবকটিকে তু'হাতে জাপটে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, কে—কে ওখানে ?

একটা খিলখিল হাসি তার পরই মুখটা জানালা থেকে অপসারিত হয়।

যুবকটি থতমত খেয়ে গিয়েছিল—বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল—অকস্মাৎ তরুণী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরায়।

কি? কি হলো? কোথায় কে?

ঐ—ঐ জানালায়—

কোথায়?

এইমাত্র কে যেন—একটা মুখ—বন্ধ করে দিন—বন্ধ করে দিন জানালাটা।

যুবকটি নিজেকে মেয়েটির আলিঙ্গন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলে, আঃ ছাড়ুন না—না হলে জানালাটা বন্ধ করবো কি করে।

না—

যুবকটি হেসে ফেলল, এই সাহস নিয়ে আপনি বাড়ি থেকে পালিয়েচেন—

মেয়েটি তার আলিঙ্গন শিথিল করে, একটু সরে বসে বলে, কে বলেচে আমি পালিয়েচি বাড়ি থেকে?

পালিয়েচেন, আর শুধু পালাননি—বড়লোকের আদুরে মেয়ে—কিন্তু আর একটু সরে বসুন না—একেবারে যে বেঞ্চ থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবার যোগাড় করলেন—

তরুণী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা যুবকটির দিকে এবং এবারে আরো একটু সরে বসল।

Thanks! যুবকটি বললে।

দূর থেকে ঐ সময় একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ গানের সুর যেন ভেসে এলো নারীকণ্ঠে। কে যেন দূরে গান গাইছে।

শুনচেন?

উঁ।

শুনতে পাচ্ছেন?

কি? যুবক তরুণীর মুখের দিকে তাকাল।

ঐ যে!

কী?

কে গান গাইচে যেন। তরুণী বললে।

কোন পেত্নীটেত্নী হবে আর কি! নির্বিকারভাবে জ্বলন্ত সিগ্রেটে একটা মৃদু টান দিয়ে যুবকটি বললে।

পেত্নী?

আশ্চর্য কি!

গানের কথাগুলো অস্পষ্ট—সুরটা ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তরুণী আবার জানালার দিকে তাকায়, আর ঠিক ঐ সময় একটা দমকা হাওয়া এসে ঘরের একটিমাত্র টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেয়। একটা বন্যজন্তুর চীৎকার শোনা যায়।

মেয়েটি সব ভুলে পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকটিকে আবার দুহাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই যুবকটি উঠে পড়েছিল জানালা বন্ধ করবার জন্য।

মেয়েটি অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে ওঠে, উঃ—

কি হলো—পড়ে গেলেন নাকি?

মেয়েটির সাড়া পাওয়া যায় না।

॥ তিন ॥

যুবক পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালাল, দেখল তরুণী তার বাঁ পাটা ডান হাতে চেপে মেঝেতে বসে আছে।

কি হলো—হাতটা ধরুন আমার—উঠুন। যুবকটি বললে।

সরে যান—

হাতটা ধরুন আমার।

না—

যুবক তখন পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে কোনমতে আবার টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাল, জানালাটা বন্ধ করে দিল, তরুণী তখনো বসে আছে মেঝের 'পরে—মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন।

এগিয়ে এলো যুবকটি। হাত বাড়াল, উঠুন—ইঃ কেটে গেছে মনে হচ্ছে—রক্ত। দেখি দেখি—

যুবক তরুণীর সামনে ঝুঁকে পড়ে বোধহয় ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করবার জন্যই—

না—সরে যান—

তরুণী আবার ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে,

Don't behave like a school girl—ধমকে উঠল যুবকটি।

আমি ইউনিভারসিটিতে পড়ি—

সে ত বোঝাই যাচ্ছে—বলতে বলতে তরুণীর সম্মতির অপেক্ষা আর না রেখে হাত ধরে তুলে তাকে বেঞ্চের উপর বসিয়ে দিল।

উঃ আঃ তরুণী কাতর অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

ইস কেটেছে বেশ! দাঁড়ান দেখি—আমার কাছে ব্যাণ্ডেজ আয়োডিন আছে—

তরুণীর আপত্তি ও বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যুবকটি তার জামার পকেট থেকে আয়োডিন ও ব্যাণ্ডেজ বের করে মেয়েটির পায়ের ক্ষত-স্থান ব্যাণ্ডেজ করে দেয়। তরুণী যন্ত্রণায় উঃ আঃ করতে থাকে।

নিন এবারে চুপটি করে বসে থাকুন। তা পড়লেন কি করে বলুন ত।

জানি না।

যুবকটি হাসল। তারপর গিয়ে ঘরের অন্য বেঞ্চেতে বসল।

প্রচণ্ড মশা।

যুবক আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে মধ্যে মধ্যে হাত দিয়ে মশা তাড়ায়।

এযে এক একটা বাদুড়ের মত মশারে বাবা—

অস্ফুট গলায় যুবক কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলে।

তরুণীও মশা তাড়াচ্ছিল হাত চালিয়ে কোন জবাব দিল না।

হঠাৎ যুবক উঠে দাঁড়াল।

এবং তাকে দরজার দিকে এগুতে দেখে তরুণী ভয় মিশ্রিত গলায় বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

বাইরে—

কেন?

বাঃ একটু আগেই ত বলছিলেন—Get out of this room.

আমি কি সত্যি সত্যিই বলেছি নাকি! মিনমিনে গলায় তরুণী বললে।

তবে কি মিথ্যে মিথ্যে বলেছেন।

না—মানে আমি—

থামলেন কেন বলুন।

না। মানে আপনাকে যেতে হবে না।

যুবকটি মৃদু হাসলো। তারপর বললে, বেশী দূর যাবো না—আশেপাশে একটু—

না—

তার মানে ?

আমি এখানে এই ঘরে একা একা থাকবো নাকি !

তা একাই ত বের হয়েছিলেন !

বেশ করেছি—তা আপনারই বা বেরুবার দরকারটা কি শুনি এই রাত্রে !

দু'দিন পেটে কিছু পড়েনি—হাসতে হাসতে বললে যুবক, আজকের রাতটাও হরিমটর করবার খুব একটা বাসনা নেই, তাই দেখি যদি কিছু খাদ্যবস্তু আশেপাশে কোথায়ও মেলে—আপনারও ত মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত ডিনারফিনার হয়নি ।

আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না ।

এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হওয়া ভাল । তাছাড়া কাল জেলে খাদ্য জুটবে কিনা আপনার তাই বা কে জানে !

জেলে যেতে হবে নাকি ?

তা উইদাউট টিকেটে ট্রাভ্‌ল্‌ করলে—

আমি কি ইচ্ছে করে করেছি নাকি ? ব্যাগ থেকে কেটে কে যেন সব টাকা নিয়ে গেল—

তা কি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করবেন ?

কেন করবে না শুনি !

জজ ম্যাজিস্ট্রেট ওরা কি আসামীর কথা সহজে বিশ্বাস করে ?

করে না ?

উহুঁ ! আসামীর কাঠগড়ার অমনিই মজা—একবার সেখানে দাঁড়ালে—

ঠিক আছে যা হবার হবে—

তা ঠিক—অমন sportsmanlike spirit থাকাই ভাল ! জেল বই ত নয় আর উপবাস বই ত নয়—তাহলে বসুন আপনি—আমি দেখি বাইরে কিছু পাওয়া যায় নাকি ।

তরুণীকে আর কোন প্রতিবাদ জানাবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে যুবকটি দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বললে, দরজাটা বন্ধ করে দিন ভিতর থেকে—আমি ডাকলে খুলে দেবেন—

শুনচেন ?

কি হলো আবার ? যুবকটি ঘুরে দাঁড়াল।

সত্যি আপনি—

কি ?

আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন না ত ?

হেসে ফেলে যুবকটি, না—

ফিরে আসবেন সত্যিই ?

হ্যাঁ—

তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু—

আচ্ছা—দরজাটা বন্ধ করে দিন—

যুবকটি চলে গেল।

কত রাত হবে কে জানে। তবে রাত সাড়ে দশটার কম ত নয়ই—

আকাশে কৃষ্ণা চতুর্দশীর বাঁকা চাঁদ দেখা দিয়েছিল ইতিমধ্যে। তারই সামান্য আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঠের ব্যবসায়ীদের আনাগোনা ছাড়া জায়গাটার কোন গুরুত্বই নেই।

লোকের বসতি বলতে যা কিছু ঐ তল্লাটে তাও মাইল দেড়েক দূরে—

ছোট একটি স্টেশন—ছোট্ট একটি বাজার—কয়েকটা দোকান। তারও বেশির ভাগ বন্ধ। কেবল খোলা ছিল তখনো একটি চায়ের দোকান।

চায়ের দোকানে আলো দেখেই যুবক সেই দিকে এগিয়ে চলে। কনকনে শীত যেন হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি জাগায়।

নাতিপ্রশস্ত কাঁচা একটি সড়ক—মধ্যে মধ্যে খোয়া বের হয়ে আছে।

রাস্তার একপাশে কাঠবোঝাই বিরাট বিরাট ছুটো লরী দাঁড়িয়ে। একটা টাঙ্গাও চোখে পড়ে।

রাস্তায় কোন লোকজন চোখে পড়ে না।

চায়ের দোকানের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল যুবকটি।

ভিতরে ত ঢুকতে যাচ্ছে—হঠাৎ তার মনে হলো যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে বা সন্দেহ করে। পুলিশ ত চারিদিকে তার খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

গুলির অভাবে সঙ্গের আগ্নেয়াস্ত্রটি পর্যন্ত ফেলে দিয়েছে জঙ্গলে আজই সন্ধ্যায়—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা নিজের গালে একবার হাত বুলিয়ে নিল —কি যেন ভাবল—তারপর পকেট থেকে একটা মাফলার বের করে কান গলা মাথা ও গাল বেশ করে মাফলারটা দিয়ে জড়িয়ে ঢেকে নিল।

স্টেশনের কাছাকাছি কোন মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। ছুটো কাঠ চেরাইয়ের কল ও তৎসংলগ্ন গুদাম।

স্টেশনের আশেপাশে দোকান বলতে ঐ চায়ের দোকানটি ও গোটা ছুই ছোটখাটো দোকান।

টিনের একটি ঘর।

ভিতরে আলো জ্বলছে দূর থেকেই নজরে পড়েছিল যুবকটির।

ও অবিশ্যি জানত না যে ওটা একটা কেবল চায়ের দোকানই নয় এখানে খাবার জিনিসও পাওয়া যায়—স্থানীয় কুলীদের জন্য।

ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে ভেবেছিল ওখানেই সন্ধান নেবে আশেপাশে কোন মিঠাইয়ের দোকান আছে কিনা।

দরজাটা খোলাই ছিল।

দরজা বরাবর আসতেই ওর নজর পড়ল ভিতরে দৃষ্টিপাত করে—সামনেই উঁচু একটা চুল্লীতে বিরাট একটা কেতলি চাপান—চুল্লীতে গনগনে আগুন।

পাশে একটা কাচের শো-কেসে পাঁউরুটি, বিস্কুট, ডিম ও তেলে-ভাজা খাবার।

মোটামত একটি লোক গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে চুল্লীর সামনে একটা চৌকীর উপরে বসে বোধহয় চা তৈরি করছে—

সামনের বেঞ্চে একটি লোক পিছন ফিরে বসে। স্থানীয় লোক বলেই মনে হয়—এবং গরীব মজদুর শ্রেনীর লোক।

চা তৈরি করতে করতে লোকটি বললে, বহুৎ ঠাণ্ডি—

সামনে উপবিষ্ট লোকটি বললে, হাঁ নাথুরামজী—এ সাল তো যাস্তি ঠাণ্ডি মালুম হোতি—

লিজিয়ে চা—চায়ের পাত্র এগিয়ে দিল দোকানদার।

যুবকটি দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

কৌন—

পরিষ্কার হিন্দীতে যুবক প্রশ্ন করে, কিছু খাবার মিলবে?

খাবার, সব খতম হয়ে গিয়েছে—ডবল রোটি আর বয়েল আণ্ডা মিলতে পারে—আর লাড্ডু—বৈঠিয়ে না—গরম চা রেডি হ্যায়—

না বসবো না। আমাকে ছুটো রোটি আর গোটা আষ্টেক বয়েল আণ্ডা দিতে পার?

নাথুরাম যেন কি ভাবল—আগন্তুক যুবকের মুখের দিকে মনে হলো যেন কেমন করে তাকাল—তারপর প্রশ্ন করল, কিধারসে আতে হেঁ?

অনেক দূর থেকে আসচি—বাস পাইনি তাই হেঁটে আসচি—কাল ভোরের ট্রেনটা ধরতে হবে—একটু চিন্তা বা দ্বিধা না করে কথাগুলো বলে গেল যুবকটি।

নাথুরাম আর কোন প্রশ্ন করল না, রুটি ডিম দিয়ে টাকা নিয়ে নিল। যুবকটি বের হয়ে গেল—

যুবকটি চলে যাবার পর নাথুরাম যে সামনে বসে চা পান করছিল তার দিকে তাকিয়ে বললে, লোকটা বলছিল বাস পেল না—এদিকে আবার বাস কোথায় প্রেমজী?

আরে জানে দো ইয়ার—আউর এক পিয়ালা চা দো—মালুম হোতা হ্যায় কোই মাতোয়ালা বওরা।

লোকটাকে দেখে যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল—

কিঁউ?

কেন, চেহারাটা দেখনি?

নেহিতো—

তা তুমি এত রাত্রে এদিকে কোথায় এসেছিলে?

লেড়কিকে তার শ্বশুরাল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম কিন্তু শালা দিল না—

নাথুরাম চা বানাতে থাকে।

বাইরে ঐ সময় ভারী জুতোর শব্দ শোনা গেল—স্থানীয় চৌকিদার রামেশীস এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

সেলাম চৌকিদার সাব্—নাথুরাম সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

আইয়ে বৈঠিয়ে—

সেলাম। চা হোবে নাকি?

জরুর—বৈঠিয়ে না।

রামেশীস বেঞ্চটার উপর বসল।

চা বানাতে বানাতেই প্রশ্ন করে, ডিউটিতে নাকি?

আর বল কেন—শালা কে একটা খুনি নাকি এই তল্লাটে এসেছে —চৌকিতে খবর এসেছে—

খুনি?

হাঁ—এদিকেই পালিয়ে এসেছে।

নাথুরামের চোখের মণিদুটো হঠাৎ যেন বারেকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা তার দোকানে এসেছিল তার চেহারাটা দৃষ্টির উপর যেন ভেসে ওঠে। কিন্তু মুখ খোলে না, চা তৈরি করতে থাকে।

রামেশীস ঐ তল্লাটের চৌকিদার।

বয়স বেশী হবে না, চল্লিশের সামান্য উপরে হয়ত। লোকটা যেমন সাহসী তেমনি কর্মঠ।

চা পানের পর অন্য লোকটি চলে গেল—রামেশীস তখন চা পান শেষ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছে—

রামেশীসও উঠে পড়ে যাবার জন্য।

নাথুরাম বাধা দিল, চৌকিদার সাব্—

কেয়া ?

যে লোকটা বলছিলে, তার চেহারা কেমন ?

কৌন, কিসকো বাত তুম্ করতে হো ভাই—

ঐ যে আভি বোলা না—খুনী—

ওঃ হাঁ—হাঁ—

তা তাকে মানে লোকটা দেখতে কেমন ?

আরে ভাই, মুঝে কেয়া পাত্তা—স্রিফ খবরে মিলা—ইধারই কোই নজদিক আশ পাশ মে উয়ো রাতিন আয়া হ্যায়—

সাচ্—

হাঁ এইসাইত খবরে মিলা—

উসকো উমর কেতনা হোগা—আপ জানতে হেঁ ?

কোই তিশ চৌতিশ হো সেকতা—লেকেন মুঝে ঠিক মালুম নেই—

মোটি না দুব্লা ?

ওউভি মালুম নেহি—আরে ছোড় দো ইয়ার—চৌকীদার ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি করতে চায় মনে হলো।

কিন্তু নাথুরামের কৌতূহলের তখনো পুরো নিবৃত্তি হয়নি—তার মনের মধ্যে তখনো একটু আগের আগন্তুক ক্রেতার চেহারাটা—বিশেষ করে চৌকীদার রামেশীসের দেওয়া সংবাদের পর একটা কৌতূহলেরই উদ্রেক করেছিল।

তাই আবার সে বললে, চৌকীদার সাব্—

কেয়া?

এক বাত কহুঁ!

কেয়া হ্যায়।

গলাটা একটু খাটো করে নাথুরাম বললে, থোড়ি পহেলে এক আদমী হামারা ইধার আয়া থা—

আদমী!

মুঝে মালুম হোতা হ্যায় উয়ো ইধার আশপাশকে রহেনেওয়ালা নেহি হ্যায়—কোই আনজান—

সাচ্—

জী—উয়ো আদমী ভি জোয়ান থা, করিব তিশ পঁয়তিশ সাল উমর হোগা—

ফির?

হামারা দোকান সে ডবল রোটি আউর আণ্ডা লে গিয়া—

নাথুরাম যথাসাধ্য তখন যুবকটির চেহারার একটা বর্ণনা দেয়।

রামেশীস উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

॥ চার ॥

যুবকটি চলে যাবার পর তরুণী দরজা বন্ধ করে ঘরের বেঞ্চের এক কোণে বসে থাকে।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল তরুণী।

হুট করে বাড়ি থেকে অমনভাবে চলে আসাটা উচিত হয়নি। কিন্তু তার মামা সন্তোষ চ্যাটার্জীকে সে বিশ্বাস করতে আর যেন কিছুতেই পারছিল না। বিশেষ করে লোকটা যে তলে তলে অমন একটা শয়তানি মতলব এঁটেছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা বুঝেছিল এই মুহূর্তে যদি সে ওখান থেকে না পালায় তার মুক্তির আর কোন পথই খোলা থাকবে না। তার মামা স্যান্টা অর্থাৎ সন্তোষ চ্যাটার্জী সব পারে।

উঃ কি শয়তান লোকটা!

আর কি জঘন্য মতলবই না এতদিন ধরে মনে মনে এঁটেছে!

সেই গবেট কুমড়োপটাশ মামার শালা ব্রজদুলাল চক্রবর্তী ইদানীং বছরখানেক ধরেই ঘন ঘন তাদের বম্বের ব্যান্দ্রার বাড়িতে আসা যাওয়া করছিল।

তখন কি ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে বন্দনা—

যেমন চেহারা তেমনি নাম। বিদ্যাবুদ্ধিও তেমনি—বারতিনেক হায়ার সেকেণ্ডারী ফেল বোধহয়। সর্বক্ষণ একগাল পান মুখে দিয়ে গরুর মত জাবর কাটছে। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় মাথাভর্তি গোবর।

তার বাবার রাখা ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা ও বম্বের ব্যান্দ্রার বাড়িটা তার সঙ্গে ঐ কুমড়োপটাশের বিয়ে দিয়ে বাগাবার জন্য তলে তলে মামীর সঙ্গে তার মামা মতলব এঁটেছিল।

বন্দনা পালিয়ে না আসলে ও হয়ত ঠিকই সেই কুমড়োপটাশটার সঙ্গে তার বিয়ে দিত।

সত্যি, তার ভাগ্যটাই বিচিত্র!

নচেৎ কোথায় তার পিতৃবন্ধু সঞ্জয় চৌধুরীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবে—বিলেত থেকে পাস করা ডাক্তার।

বাবা ত সবই ঠিক করে রেখেছিলেন, হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল—ছেলেটি কাকে যেন খুন করে ফেরার হলো—

মামা স্যান্টা চ্যাটার্জীর সে সংবাদে কি উল্লাস!

বন্দনা, শুনেছিস?

বন্দনা সবে তখন ইউনিভারসিটি থেকে ক্লাস করে বাড়িতে ফিরেছে।

বললে, কি মামা?

সেই ছেলেটি রে—যার সঙ্গে তোর বিয়ে হবার কথা—

কি হয়েছে তার?

খুন করে ফেরার হয়েছে।

বল কি মামা!

আর বলি কি! খবরের কাগজে যে সব বের হয়েছে!

তাই নাকি!

হ্যাঁ—সাংঘাতিক ছেলে। ভাগ্যে বিয়েটা হয়নি—যাক তুই ভাবিস না—ভাল ছেলের অভাব কি? হুঁ! তোর মত মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা।

তখনো বুঝতে পারেনি বন্দনা সেই ভাল ছেলেটি কে—কেন মামার অত দরদ।

তারই হপ্তাখানেক পরে তাদের ব্যান্ড্রার বাড়িতে কুমড়োপটাশের আবির্ভাব।

এসেছে—এসেছে মামার শালা—ও নজরই দেয়নি—তাছাড়া লোকটাকে দেখলেই ওর হাসি পেত এমন।

একদিনত ব্রজদুলাল জিজ্ঞাসাই করলো—বন্দনা, তুমি আমাকে দেখলে ফিক্ ফিক্ করে হাসো কেন ?

—কে বললে ?

—দেখেচি আমি—হাসো। কেন হাসো—

—আপনাকে দেখে হাসবো কেন ? এমনিইত আমি হাসি—

তারপরই একদিন সকালে—

মামী শুধান, আমার ভাইকে তোর কেমন লাগছেরে বন্দনা ?

বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেয়েছিল কথাটা শুনে, কিন্তু হাসেনি, গম্ভীর হয়ে বলেছিল, মন্দ কি।

বেশ চেহারাটা না ?

হুঁ। প্রাণপণে হাসি গোপন করার চেষ্টা করছে তখন বন্দনা।

লেখাপড়াতেও ভাল ছিল খুব—দারুণ মেধাবী কিন্তু পড়াশুনা করলো না—

কেন ?

বিরাট কাজ কারবারত—কে দেখা শোনা করে তাই আর কি।

তাই বুঝি ?

তবে! পশ্চিমবাঙ্গলায় বিরাট ব্যবসা—বাড়ি গাড়ি—

খুব বড়লোক বুঝি ?

তবে। অনেক টাকা ব্যাংকে।

বন্দনা পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

সে যাত্রায় দিন কুড়ি ছিল ব্রজদুলাল। বন্দনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বন্দনা পাত্তা দেয়নি—পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

দিন কুড়ি বাদে চলে গেল—আবার এলো মাসখানেক পরে—এবারে যেন আরো গায়ে পড়া হয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে ব্রজদুলাল।

তারপরই হঠাৎ একদিন—

সে সবে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরেছে—দোতলায় নিজের নিজের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছে।

ব্রজদুলাল এসে ঘরে ঢুকল, বন্দনা—

কি ব্যাপার? আপনি এঘরে কেন?

কেন—দোষ হয়েছে নাকি?

একগাল পান মুখে চিবুতে চিবুতে হাসতে থাকে ব্রজদুলাল ওর দিকে তাকিয়ে।

যান এঘর থেকে!

যাবো কেন—দু'দিন বাদে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে জান?

বিয়ে? আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ গো—কেন দিদি জামাইবাবু তোমায় কিছু বলেনি। এবারে ত সেইজন্যেই এসেছি—

—তাই নাকি?

—হুঁ।

—সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে বুঝি?

—হ্যাঁ—সব Complete. দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির —

—ঠিক আছে—যান আপনি এখন এঘর থেকে।

—চল না সিনেমায় যাই—দুজনে!

—আপনি যাবেন কিনা এঘর থেকে জানতে চাই?

—দু'দিন বাদেইত তোমার হাসব্যাণ্ড হচ্ছি আমি—

বন্দনা আর কোন কথা না বলে ঝড়ের মতই নিজের ঘর থেকে বের হয়ে সোজা মামীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মামী আলমারী খুলে কি যেন বের করছিলেন।

বন্দনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, মামী—

কি রে?

তোমার ভাইকে আমার ঘরে যেতে বারণ করো।

কেন? কি হয়েছে?

যা বললাম তাই করো।

মামীর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিল, কিন্তু তোর মামা ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবে স্থির করেছে—

তাহলে ওকে খুন করবো জেনো—

কি বললি?

হ্যাঁ—খুন—ওকে বলে দিও খুন যদি আমার হাতে না হতে চায় ত আমার ঘরে যেন আর না যায়—

কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। নিজের ঘরে এসে ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করেছিল।

বন্দনা তার মামাটিকে ভাল করেই জানত। লোকটা যেমন অর্থগৃধ্নু তেমনি স্বার্থপর—নিজের স্বার্থের জন্য দুনিয়ায় এমন কোন কাজ ছিল না তার মামা করতে পারত না।

তাহলেও বন্দনা ভেবেছিল—সম্পূর্ণ সাবালিকা সে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে হয়ত মামার সাহস হবে না।

মামা মামী অবিশ্যি ঐ দিনের পর তার বিবাহ সম্পর্কে কোন আর উচ্য-বাচ্যই করেনি—কিন্তু ব্রজদুলালকে দেখা গেল খোস মেজাজে তাদের ব্যান্ড্রার বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছে।

হঠাৎ একদিন বন্দনা লক্ষ্য করলো বাড়িতে দু'জন দরোয়ান নিযুক্ত হয়েছে—তারা দক্ষিণ গেটে প্রহরা দিচ্ছে। বাড়ির গাড়ির ড্রাইভারও বদল হলো কয়েকদিনের মধ্যে।

মামা মামী যেন প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে—তাকে সামনে দেখলেই চুপ করে যায়। বন্দনা বুঝতে পারে একটা ষড়যন্ত্র তলে তলে দানা বাঁধছে।

বন্দনা কি রকম যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

বন্দনা প্রথমটা কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। অবশেষে অনেক ভেবে একটা মতলব ঠাওরায়।

এক বান্ধবীকে ফোনে আসতে বলল—

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করল—দিন দুই বাদে সেই বন্ধু এসে বললে, চল মেট্রোতে একটা ভাল ছবি এসেছে দেখে আসি—

মামা বাড়িতে ছিল না—বন্দনার ইংগিতে বান্ধবী গিয়ে মামীকে বললে, ওকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাবো মামী ?

সিনেমায় !

হ্যাঁ, টিকিট কেটে ফেলেছি—আমিই আবার নামিয়ে দিয়ে যাবো।

মামী, আপত্তি করতে পারল না।

নিজের কাছে শ চারেক টাকা ছিল সেই টাকা হ্যাণ্ড ব্যাগে নিয়ে বন্দনা তার বান্ধবীর সঙ্গে তাদেরই গাড়িতে সিনেমায় যাবার নাম করে বের হয়ে পড়লো।

কলকাতায় বন্দনার এক বান্ধবী থাকে তাকে আগেই চিঠি দিয়েছিল—বন্দনা যে কলকাতায় যাচ্ছে—

বান্ধবী বন্দনাকে ভি. টি. তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বন্দনা স্টেশনে নেমে হঠাৎ দূর থেকে ব্রজদুলালকে দেখতে পেয়ে আর টিকিট কাটার সময় পেল না—সোজা গেট দিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়লো ভিড়ের মধ্যে।

সামনে যে ট্রেনটা পেয়েছিল তাতেই উঠে পড়েছিল।

বদ্ধ দরজায় ধাক্কা মৃদু মৃদু, শুনছেন—দরজাটা খুলুন—

সংবিৎ ফিরে এলো বন্দনার। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল ওয়েটিং রুমের—

কি ব্যাপার, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ? যুবক জিজ্ঞাসা করে, কখন থেকে ডাকচি—নামটাও জানি না আপনার নিন—বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না—গোটা আষ্টেক বয়েল ডিম আর দুটো কোয়ার্টার পাঁউরুটি পাওয়া গিয়েছে—

যুবক চারটে ডিম ও একটা পাঁউরুটি এগিয়ে দিল বন্দনার দিকে, নিন—খেয়ে নিন—

না—

কি না ?

আমার ক্ষিদে নেই।

এখন না থাকলেও কাল পাবেই ক্ষিদে—তখন এও জুটবে না হয়ত—

না জুটুক—

যুবক মুহূর্তকাল কি যেন ভাবল, তারপর বললে, বেশ—না খেলে আর কি করবো—

ঠিক ঐ সময় কাচের জানালার ওপাশে একটা মুখ দেখা গেল।

কে ? কে ওখানে ? বন্দনা চিৎকার করে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে।

কোথায় ? কোথায় কে ?

একটু আগে জানালার ওপাশে একটা যেন মুখ দেখলাম—

যুবকটি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার শার্সি খুলে হাতের টর্চ ফেলে বাইরে দেখল কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়ল না।

জানালা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলো, কই কেউ ত নেই—

আমি স্পষ্ট দেখেচি।

ঠিক আছে আপনি দরজা বন্ধ করে বসে থাকুন—আর কয় ঘণ্টাই বা রাত আছে—ভয় করলে সিগন্যালার বা পয়েন্টস্‌ম্যানকে ডাকবেন।

কেন—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

আমায় এখুনি যেতে হবে—

যেতে হবে মানে ?

মানে আর কি এখানে বসে থাকলে ত চলবে না।

আমি এখানে একলা থাকবো নাকি—

একলা থাকবেন বলেই ত এঘরে এসেছিলেন—

মরে গেলেও এখানে আমি একা একা থাকতে পারবো না, বলতে বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ায়, আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

আমার সঙ্গে যাবেন ?

হ্যাঁ—

কোথায় ?

যেখানে আপনি যাবেন।

আমার সঙ্গে আপনি যাবেন! আমার কোন পরিচয়ই ত আপনি জানেন না। কে আমি—কি রকম লোক—চোর ডাকাত না খুনি আসামী একটা—

যাই হোন আপনি—আমি যাবো আপনার সঙ্গে—

না, তা হয় না।

কেন হয় না—

আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন না—

খুব পারি—তারপরেই বলে, এইখানে আপনি আমাকে একা ফেলে যাবেন নাকি—খুব মানুষ ত আপনি!

বা রে—আপনি কি আমার সঙ্গে এসেছেন না আমি আপনার সঙ্গে এসেছি—যে আমি যেখানে যাবো সেখানে আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

অতশত আমি জানি না—মোট কথা আপনি আমাকে এখানে একা ফেলে যেতে পারবেন না—আর যদি যান ত আমিও সঙ্গে যাবো!

কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি নিজে—

কিছু জানতে চাই না—আমি আপনার সঙ্গে যাবো—বন্দনার গলা যেন ভিজে ভিজে—বলতে বলতে বন্দনা উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন আপনি ?

কলকাতায়—

কিন্তু আমি ত কলকাতায় যাবো না—ঠিক আছে আমি টাকা

দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে—বলে দশ টাকার কয়েকটি নোট যুবক পকেট থেকে বের করল, এই টাকা রাখুন—কাল এখান পর্যন্ত টিকিটের টাকা দিয়েও এতে কলকাতা পর্যন্ত আপনার যাওয়া হয়ে যাবে—একটা কলকাতার টিকিট কেটে এবারে ট্রেনে উঠে বসবেন।

বন্দনা গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হলো? নিন ধরুন টাকাটা—

না—

আমি জানি টাকার আপনার দরকার। বেশ এমনি না নেন মনে করুন ধার নিচ্ছেন—একটা ঠিকানা দিচ্ছি—ডাঃ সুধামাধব চক্রবর্তী, সেণ্ট্রাল নার্সিং হোম, ৩ নং আয়রনসাইড রোড, কলকাতা—ঐ ঠিকানায় টাকাটা না হয় পাঠিয়ে দেবেন—নিন—

বন্দনা কোন সাড়া দেয় না—টাকা নেবার কোন লক্ষণও দেখায় না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে।

যুবকটি অতঃপর দরজার দিকে এগিয়ে যায়—বন্দনাও তার পিছনে পিছনে এগোয়।

যুবক আবার দাঁড়াল। এবং বললে, সত্যিই আপনি বিশ্বাস করুন আমার সঙ্গে আপনার যাওয়া সম্ভব নয়—তাছাড়া এখানে আর বেশীক্ষণ আমার পক্ষে থাকাও নিরাপদ নয়—নচেৎ আজ রাতটা থেকে কাল সকালে আপনাকে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে যেতাম।

কে আপনাকে অত দয়া দেখাতে বলচে। যান না যেখানে খুশি আপনার—

সত্যিই আমি কলকাতায় যাচ্ছি না—কোথায় যাবো তাও জানি না। শুধু এখুনি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমি এইটুকুই জানি—

আমি কি আপনাকে আটকে রেখেচি—চলে যান না—

যুবক হাসলো, ওটাত আপনার রাগের কথা হলো। শুনুন—সত্যিই আমার সঙ্গে যাওয়ায় আপনার বিপদ আছে—

কোন বিপদ নেই। ও! কেবল আমাকে আপনি এড়াতে চান তাই ওকথা বলচেন।

যুবক অতঃপর যেন কি ভাবল। তারপর বললে, আপনি আমার সঙ্গেই যাবেন ?

হ্যাঁ—

আমি যেখানে যাবো সেখানেই যাবেন ?

হ্যাঁ—

ভয় করবে না আপনার একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেতে।

ভয় কি ? আপনি ত আর বাঘ ভাল্লুক নয়—একজন ভদ্রলোক।

বুঝলেন কি করে আমি ভদ্রলোক।

জানি আমি—

জানেন ?

হ্যাঁ—

বেশ তবে চলুন—তবে একটা শর্তে।

কি শর্ত শুনি ?

প্রথমত আমি সোজা রাস্তা দিয়ে যাবো না—

তবে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবেন ?

যে রাস্তায় সাধারণত বড় একটা কেউ হাঁটা চলা করে না। হয়ত পথে বনজঙ্গল খানাখোদল পড়বে—পারবেন সে রাস্তায় যেতে ?

পারবো।

তারপর কোথায় যাবো তারও ত কোন ঠিকঠিকানা নেই—

তা হোক—

তবু যাবেন ?

হ্যাঁ—

বেশ তবে চলুন—তবে মনে রাখবেন। আপনি কিন্তু রাতটুকুই আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন—ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের দুজনের পথ আলাদা—অর্থাৎ সেখান থেকেই আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নেবো—

বন্দনা মনে মনে যেন কি ভাবল তারপর বললে, বেশ—তাই হবে—

তবু যাবেনই আপনি আমার সঙ্গে ?

হ্যাঁ—

তবে আর কি—চলুন। আসুন—

যুবক ফুঁ দিয়ে ঘরের একটিমাত্র আলো নিভিয়ে দিল, তারপর দুজনে অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ইতিমধ্যে আকাশে যে অসময়ে মেঘ জমেছে ওরা জানতেও পারেনি।

স্টেশনটা ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হলো।

একে প্রচণ্ড শীত তার উপরে ঐ বৃষ্টি।

দুজনে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে যায়—কিন্তু বৃষ্টি ক্রমশঃই ঝেঁপে আসে।

হঠাৎ যুবকের নজরে পড়ে অল্প দূরেই একটা বাড়ির জানালাপথে আলো দেখা যাচ্ছে।

নাঃ বৃষ্টি বেশ জোরে এলো দেখচি, যুবকটি বললে, চলুন ঐ বাড়িটায় আশ্রয় নেওয়া যাক—

দুজনে চলার গতি আরো দ্রুত করে।

ওরা জানত না যে ওটাই স্টেশন মাস্টার শান্তাপ্রসাদেরই কোয়ার্টার।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ওদের কানে এলো এক পুরুষকণ্ঠ, বংশীলাল, কোথায় গেলি জলদি যা, ডাক্তারবাবুকে এখুনি একবার ডেকে নিয়ে আয়—এই বংশীলাল—কোথায় গেলি! জ্বর ভীষণ বেড়েছে—কিরকম যেন করছে। বংশীলাল—বংশীলাল—

প্রৌঢ় শান্তাপ্রসাদ বিচলিত হয়ে কথাগুলো বলতে বলতে ঘরের বাইরে বের হয়ে এলেন—আর যুবকটি সেই সময় বন্দনাকে নিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে অনন্যোপায় হয়ে ঘরের সামনে বারান্দায় এসে উঠেছে।

বংশীলাল—

অন্ধকার—বৃষ্টিও মুষলধারায় নেমেছে ততক্ষণে—ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

প্রথমটায় অন্ধকারে ওদের দেখতে পান না শান্তাপ্রসাদ—কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় ওদের দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন, কে ? কে ওখানে—

আমরা বৃষ্টির জন্য—যুবক বললে।

বংশীলাল ! চেঁচিয়ে ডাকলেন আবার শান্তাপ্রসাদ।

কি হয়েছে ? কার অসুখ ? যুবক এবারে প্রশ্ন করল।

শান্তাপ্রসাদ বললেন, আমার নাতির—বংশীলাল—কোথায় আপনার নাতি ? যুবক আবার প্রশ্ন করল।

ভিতরের ঘরে—

চলুন ত দেখি—আমি একজন ডাক্তার।

আপনি ডাক্তার—আসুন আসুন—

যুবককে নিয়ে শান্তাপ্রসাদ ভিতরের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাও যায়।

মাঝারি আকারের একটি শয়নঘর। একটা ভাঙ্গা কাঠের আলমারি—দুটো ট্রাংক—একটা আলনা।

একটা শয্যার উপরে দশ-এগার বছরের একটি বালক নিঃসাড়ে পড়ে আছে—কম্বল দিয়ে বুক পর্যন্ত আবৃত।

দেখিয়ে ডকটার সাব্ মেহেরবানি করকে—আমার নাতি—ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না—শান্তাপ্রসাদের গলা কান্নায় যেন বুজে এলো।

যুবক এগিয়ে গেল। ছেলেটির নাড়ি পরীক্ষা করে বললে, ঘাবড়াইয়ে মাত্—থোড়া গরম পানি মিলেগা ?

গরম পানি—

হাঁ—দেখিয়ে জলদি—

ঐ সময় বন্দনা এগিয়ে এলো, রান্নাঘর কোথায় চলুন—আমি গরম জল করে দিচ্ছি—

শান্তাপ্রসাদ বন্দনার দিকে তাকালেন, দামী শাড়ি পরনে—

আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা—কেমন যেন বিহ্বল মনে হয় তাঁর দৃষ্টি, এতক্ষণ বন্দনার দিকে তাঁর নজর পড়েনি—

যুবক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমার বোন—আমরা এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম—হঠাৎ বৃষ্টি আসায় আপনার বাড়ির দরজার সামনে উঠে পড়েছি—

শান্তাপ্রসাদের দৃষ্টির বিহ্বলতা তখনো কাটেনি। যদিও চোস্ত হিন্দীতে কথাগুলো বললে যুবকটি কিন্তু তার চেহারা বেশভূষা মলিন ট্রাউজার গলাবন্ধ একটি অনুরূপ মলিন কোট মাথায় মিলিটারী ব্যের ক্যাপ মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—তার সঙ্গের ঐ সুন্দরী আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা দামী শাড়ি পরিহিতা মেয়েটি তার বোন—

বন্দনাও বোধহয় ব্যাপারটা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল।

গায়ে পড়া হয়ে যুবকটির এখানে ঢোকা তার পছন্দ হয়নি কিন্তু এখন আর উপায় কি!

সেও তাড়াতাড়ি বললে, চলিয়ে না—

কিন্তু শান্তাপ্রসাদের অতশত ভাববার মত ঐ মুহূর্তে মনের অবস্থা ছিল না। তার একটিমাত্র আদরের নাতির সংকটময় অবস্থাই তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—সমস্ত চিন্তার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল।

যুবকটি আবার বললে, ইধার নজদিক আশপাশমে কোই দাবাখানা হ্যায়?

আশপাশ ত নেহি হ্যায়—যো হ্যায় ইঁহাসে এক মিইল হোগা করিব—শান্তাপ্রসাদ বললেন।

একঠো কাগজ আউর পিনসিল দিজিয়ে—একঠো দাওয়াই লিখ দেতা হ্যায়—জলদি কিসিকো ভেজকে দাওয়াইঠো লাইয়ে—

শান্তাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজ ও একটা পেনসিল এনে দিলেন।

যুবকটি একটা ঔষধের নাম কাগজে লিখে এগিয়ে দিল, লিজিয়ে কিসিকো জলদি ভেজ দিজিয়ে—

যুবকটি কাগজটা হাতে তুলে দিল শান্তাপ্রসাদের।

মুঝেই যানে পড়েগা। বংশীলাল সায়েদ স্টেশন চলা গিয়া—

আউর কোই নেই হ্যায় ? যুবক শুধায়।

কোই নেই হ্যায় ডকটর সাব্। এক নোকড়ানী হ্যায়—সুবে সাম দো টাইম আতি হ্যায়—ফির কাম করকে চলি যাতি হ্যায়—

শান্তাপ্রসাদের কথা শেষ হলো না—বংশীলাল ঠিক ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল, মাস্টারজী—

কিন্তু ঘরের মধ্যে আরো দুজনকে দেখে হঠাৎ থেমে গিয়ে, বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিনতে পেরে বললে, আপ্ হিঁয়া—

বন্দনা বিব্রত বোধ করে—

বংশীলাল বললে, মাস্টারজী—ও ওহি জেনানা যিনে বিনা টিকিটসে—

শান্তাপ্রসাদের তখন ওসব কথা শোনার সময় নেই, তিনি বললেন, বংশীলাল, এক কাম করো ভাই—

কেয়া মাস্টারজী ?

এই পুর্চাঠো লে যাও—জলদি দাওয়াঠো লাও—রূপিয়া দেতা হ্যায়—বলতে বলতে শান্তাপ্রসাদ ঘরের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বংশীলাল বললে, রূপিয়াকি জরুরৎ নেহি হ্যায় মাস্টারজী। হামারা পাশ হ্যায়—

তব্ জলদি যাও ভাই।

বংশীলাল আর কথা বাড়ায় না, চলে গেল।

সায়েদ মালুম হোতা হ্যায় আপহি স্টেশন মাস্টার হ্যায় ? যুবক প্রশ্ন করল।

জী হাঁ—

লেকিন গরম পানিকো কেয়া হোগা—

ম্যায় আভি লাতা হুঁ পানি গরম করকে—

শান্তাপ্রসাদ পাশে রন্ধনশালার দিকে এগোলেন। বন্দনা তাঁকে অনুসরণ করল।

দাবাখানার দিকে যেতে যেতে বংশীলাল একটা কথা ভাবছিল।

একটু আগে স্থানীয় চৌকিদার সাহেব রামেশীস স্টেশনে এসেছিল অদূরবর্তী থানায় একটা জরুরী টেলিফোন করবার জন্য।

বংশীলাল তখন শয়নের ব্যবস্থা করছে। বংশীলাল কোথায় ভেবেছিল কাছেই মাইলখানেকের মধ্যে মাঘী মেলা বসেছে—হৈহল্লা নাচগান—সেখানে স্ত্রী লছমীকে নিয়ে যাবে—কারণ রাতের ঐ ট্রেনটা পাস করাবার পর ত রাতের মত ছুটি—তা আর হলো না—একে মাস্টারজীর নাতির অসুখ—মাস্টারজী তার উপরেই স্টেশনের ভার দিয়েছেন রাত্রির মত তার উপরে এক ফ্যাসাদ।

এক জেনানা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল তাকে টি. টি. আই. তাদের জিম্মায় দিয়ে গিয়েছে। মাস্টারজীকে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিল।

শান্তাপ্রসাদ বললেন, রাতে ওয়েটিং রুমেই থাক—ভোর হলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

ও ভেবেছিল ওয়েটিং রুমে বাইরে থেকে একটা তালা লাগিয়ে চলে যাবে—পরে কি ভেবে মতলবটা পরিত্যাগ করেছিল।

মনটা তাই বিগড়েই ছিল।

কপালে আছে স্টেশনেই রাতটা কাটান—সেই ব্যবস্থাই করছিল এমন সময় রামেশীসের আবির্ভাব।

চৌকিদার সাহেব যে—কি খবর? এত রাত্রে—

একটা ফোন করবো—রামেশীস বললে।

ফোন। কোথায়?

থানায়—

কেন ? কোন জরুরী খবর আছে নাকি ?

আর বল কেন ভাই—এক বেটা খুনী এদিকেই কোথায় পালিয়ে এসেছে চৌকিতে কিছুক্ষণ আগে খবর এসেছিল—কি করি, ডিউটি—বের হয়েছিলাম ভাই—ঐ রেস্টুরেণ্টের মালিক নাথুরাম বললে একটু আগে নাকি কে একটা অপরিচিত লোক ডবল রুটি আর আণ্ডা কিনে নিয়ে গিয়েছে—

কেমন দেখতে ?

ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দেখেছো নাকি এমন কাউকে ভাই এদিকে ?

নেহি ত ! এক জেনানা—

জেনানা ?

হ্যাঁ—এক জেনানা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—টি. টি. আই. সাহেব তাকে আমাদের জিম্মায় দিয়ে গিয়েছে—ওয়েটিং রুমে আছে—

সত্যি কথা বলতে কি বংশীলাল একটু ভীতু প্রকৃতিরই লোক—কোন এক খুনী আসামী এদিকে এসেছে শুনে তার ভয়ই ধরে যায়।

রামেশ্বর ফোন করে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো—

চললে চৌকিদার সাহেব ?

হ্যাঁ—চলি—

যদি এখানে এসে পড়ে—

কে ?

কে আবার সেই খুনী আসামীটা—

চৌকিতে একটা খবর পাঠিয়ে দিও—লোকটা ভারী ধূর্ত—শয়তান। দেড় বছর ধরে সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে—

বল কি ! কি জাত—

শুনেছি নাকি বাঙ্গালী—তবে হিন্দী বাত্ খুব ভাল বলতে পারে—

গায়ে বুঝি খুব তাগত—

তা আর নেই—ভীষণ তাগত—

রামেশীষ চলে গেল।

বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি নেমেছে। বংশীলাল সিগন্যালার কামতা-প্রসাদকে ডাকল বাইরে বের হয়ে কিন্তু তার কোন পাত্তা পেল না।

একা স্টেশনে—যদি ঐ সময় খুনীটা এসে হাজির হয়— তাছাড়া স্টেশন মাস্টার তাকে নাতীর অসুকের জন্য তার কোয়ার্টারেই থাকতে বলেছিল কিন্তু সে থাকেনি চলে এসেছ তাকে না জানিয়েই—

একা একা স্টেশনে থাকতেও ভয় করছে—বংশীলাল অবশেষে স্টেশন রুমে তালা দিয়ে বের হয়ে পড়ল—স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারের দিকেই আবার।

দাওয়াখানা যেতে যেতে অন্যমনস্ক ভাবে বংশীলাল ভাবছিল—শান্তাপ্রসাদের ঘরে এইমাত্র যে লোকটাকে দেখে এলো সে লোকটা কে? লোকটার মুখেওত খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কেমন যেন ষণ্ডাগুণ্ডাই দেখতে।

বংশীলাল জোরে জোরে পা চালায়।

বন্দনার সাহায্যেই চুল্লী জ্বালিয়ে শান্তাপ্রসাদ কোনমতে একটা কেতলিতে করে জল গরম করে নিয়ে আসেন।

তাঁর নাতি বাবুয়া তখনো অজ্ঞান।

লিজিয়ে ডক্টর সাব্ গরম পানি—শান্তাপ্রসাদ বললেন।

ঠিক হ্যায়, থোড়া ঠাণ্ডা পানিকে ভি জরুরৎ হ্যায়—

ম্যায় ঠাণ্ডা পানী আভি লাতা হুঁ বলে, শান্তাপ্রসাদ বের হয়ে গেলেন আবার ঘর থেকে।

বাইরে তখনো অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

এক বালতি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন শান্তাপ্রসাদ। বন্দনার

সাহায্যে দুটো জল মিশিয়ে অসুস্থ বালকের মাথা ধুইয়ে দিল ও গা বেশ করে স্পঞ্জ করে দিল যুবকটি।

ধীরে ধীরে বালক চোখ মেলল একটু পরে—

বাবুয়া!

দাদু—

কেয়সা হ্যায় মেরে লাল—

মা—

জ্বর কমলেও তখনো একটা আচ্ছন্ন ভাব রয়েছে বালকের—

পাশেই ছিল বন্দনা, তার দিকে তাকিয়েই বোধ হয় ভুল করে বাবুয়া ডাকে, মা—

যুবকটির মুখের দিকে তাকায় বন্দনা—যুবকটি তাকে কি ইশারা করে।

বন্দনা প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে তারপর এগিয়ে যায় শয্যার কাছে, বাবুয়া—

তুম্ আ গেয়ি—মুঝে ছোড়কে আর নেহি যাওগি ত?

নেহি বেটা—তুম্ নিদ যাও—

বাবুয়া বন্দনার একটা হাত চেপে ধরে—জ্ঞান ফিরে এলেও জ্ঞান তখনও তার পরিষ্কার নয়—ঝাপসা ঝাপসা দুর্বল ক্ষীণ মস্তিষ্ক।

যুবকটি এবারে উঠে দাঁড়ায় শয্যার পাশ থেকে, মাস্টারজী—

ডকটর সাব্—

ইজাজৎ হো তো—আমি এবারে যাবো—

কিন্তু শান্তাপ্রসাদ কিছু বলার আগেই সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভেজা—মাথার চুল খোলা—এলোমেলো ভাবে শাড়ি পরা এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকল—

শান্তাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে—বেটি, তোর লেড়কার বহুৎ বুখার—

ওরা বুঝতে পারে ঐ শান্তাপ্রসাদের বিকৃতমস্তিষ্কা কন্যা।

আর বন্দনা আশ্চর্য হয় ঐ·মেয়েটির মুখই সে ওয়েটিংরুমের জানলা পথে দেখেছিল।

উয়ো আয়া বাবুজী—শান্তাপ্রসাদের মেয়ে ইধার জরুর আয়েগা—

কোন ট্রেন সে—কাপড়া বদল লেও বেটি—

কিঁউ—

সব গিলা হো গিয়া—

আহা ম্যায় চলতা হুঁ—তরুণী বের হয়ে গেল।

শান্তপ্রসাদ ডাকেন বিটি—বিটিয়া—কোন সাড়া পাওয়া গেল না—দূর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এলো কেবল বৃষ্টির শব্দের মধ্যে—বাইরে তখনো বৃষ্টি ঝরছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা আবার যুবকটি বললে, তাহলে আমি এবারে যাই ?

আপনি চলে যাবেন ? শান্তাপ্রসাদ শুধান।

হ্যাঁ—যে ঔষধটা আনতে পাঠিয়েছি সেটা এলে দশ ফোঁটা জল দিয়ে খাইয়ে দেবেন—আবার এক ঘণ্টা বাদে দশ ফোঁটা। এখন ও ঘুমোবে—আশা করচি কাল সকাল নাগাদ ও অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে—

বাবুয়া সত্যিই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন অনেক কম।

॥ ছয় ॥

শান্তাপ্রসাদ কৃতজ্ঞতাভরা কণ্ঠে বললেন, জানি না ডকটর সাব্ এসময় এখানে কোথা থেকে আপনি এলেন—নিশ্চয়ই আপনি ঈশ্বরপ্রেরিত —এসময় আপনি এসে না পড়লে হয়ত ওকে বাঁচানোই যেতো না—

যুবকটি বললে, একজন ডাক্তার হিসাবে যতটুকু কর্তব্য তার বেশী ত আমি কিছুই করিনি মাস্টারজী। আচ্ছা যদি ইজাজৎ হয় ত আমি এবারে যাবো—

না ডকটর সাব্ এই ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে বিশেষ করে এই বৃষ্টির মধ্যে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না—ভোর হোক বৃষ্টি থামুক তারপর যাবেন—

না—আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়—

কতক্ষণই বা আর রাত আছে—বাকী রাতটুকু—

আপনি আমাকে যেতে দিন মাস্টারজী—

না—আমি আপনার কোন কথাই শুনবো না—

বুঝতে পারচেন না আপনি মাস্টারজী—

না, না—সেটা সত্যিই অধর্ম হবে—কৃতজ্ঞতা বলেওত একটা কথা আছে। শান্তাপ্রসাদ বললেন।

মাস্টারজী, আমি এখানে থাকলে হয়ত আপনার বিপদ হতে পারে।

—বিপদ।

—হ্যাঁ—আর সেটা আমি চাই না—

—লেকিন—

—না মাস্টারজী আমার জন্য কেন আপনার বিপদ ডেকে আনবেন—

—আপনি থাকলে আমার বিপদ হবে। কি বলচেন আপনি—

—হ্যাঁ—মাস্টারজী তাই হবে—

মাস্টারজী এবার মৃদু গলায় বললেন, বিপদ—

আপনি জানেন না কতবড় ঝঞ্ঝা আমার জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে—বিপদের ভয় আর আমি করি না। তাছাড়া আমার বাবুয়া আপনি না থাকলে হয়ত বাঁচবে না।

ভয় নেই আপনার—আমার মনে হয় যে ঔষধ লিখে দিয়েছি তাতেই আপনার নাতী ভাল হয়ে যাবে মাস্টারজী—আমাকে এবারে যেতে দিন—

—না—ভোর হোক তারপর—

—মাস্টারজী শুনুন, আপনি জানেন না কে আমি, কি আমার সত্য পরিচয়—কোথা থেকে আসচি—

যেই হোন আপনি ডক্‌টর সাব্‌—যে পরিচয়ই আপনার হোক—আপনি আমার কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত—

শুনুন মাস্টারজী—আমি, একটা চোর—একটা ভয়ানক ডাকাত যা একটা খুনীও ত হতে পারি!

কভি নেহি—আপ দেওতা হ্যায়—

নেহি মাস্টারজী নেহি—হামারা বাত মানিয়ে—মুঝে যানে দিজিয়ে—শুধু একটা কাজ যদি করে দেন ত—

কেয়া ডকটর সাব্‌?

আমি কিছু টাকা রেখে যাচ্ছি—বম্বে থেকে ওঁর টিকিটের ভাড়া কেটে বাকী টাকা দিয়ে ওঁর একটা কলকাতার টিকিট কেটে ওঁকে কলকাতাগামী ট্রেনে তুলে দেবেন—পথে ওঁর সব টাকা ব্যাগ কেটে চুরি হয়ে গিয়েছে—

সাচ্‌ বেটি? শান্তাপ্রসাদ বন্দনার দিকে ফিরে তাকালেন।

বন্দনা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ—

কোই চিন্তা না করিয়ে ডকটর সাব্‌—লেকেন আপ আপকো বহিনকো একেলে ছোড়কে—

উনি আমার বোন নন মস্টারজী—

আপনার বোন নন ?

না—

তবে ? তবে উনি কে ?

জানি না ওঁর পরিচয়—আজই হঠাৎ ওয়েটিং রুমে প্রথম ওঁর সঙ্গে আমার দেখা—

শান্তাপ্রসাদ কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার যুবকটির মুখের দিকে তাকান তারপর বন্দনার মুখের দিকে।

যুবক বললে, ওঁর পরিচয় আমি জানি না, আর উনিও আমাকে চেনেন না—তবে উনি কোন ভদ্র ঘরেরই মেয়ে—আমার সঙ্গে উনি ওয়েটিং রুম থেমে জোর করে এসেছেন—আমার কোন কথা শোনেননি—কিন্তু উনি আমার সঙ্গে থাকলে ওঁর বিপদের সম্ভাবনাই বেশী—

বিপদ !

মাস্টারজী, আপনার কাছে আর গোপন করবো না—পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—

পুলিশ !

যুগপৎ কথাটা শান্তাপ্রসাদ ও বন্দনার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, সত্যি বলচেন ?

হ্যাঁ মাস্টারজী সত্যিই আমি একজন ফেরারী—খুনের অপরাধে অপরাধী। আজ দেড় বছর প্রায় পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াখাওয়া কুকুরের মত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছি—absconder—

নেহী—শান্তাপ্রসাদ তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন, এ হামে কভি নেহি বিশ্বোয়াস কর সকতে হো—আপ কিসিকো কভি খুন নেহি কর সকতা—নেহি নেহি—ইয়ে না মুমকিন হ্যায়—

কিন্তু সত্যিই আমি জয়ন্ত বোসকে খুন করেছি—Yes I murdered him.

আপনি—কাকে, কাকে খুন করেছেন বললেন, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বন্দনা।

জয়ন্ত বোসকে। বললে যুবক।

—সত্যি সত্যিই তাহলে আপনি তাকে খুন করেছেন।

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন, কেন খুন করলেন।

খুন হয়ত করতে আমি চাইনি—কিন্তু যে দৃশ্য আমি দেখেছিলাম তারপর কোন মানুষ স্থির থাকতে পারে না—

আপনার নাম সমীর চৌধুরী—

আপনি আমাকে চেনেন? বিস্মিত সমীর প্রশ্নটা না করে পারে না বন্দনাকে।

চিনি—আপনাকে দেখেও প্রথমটায় যেন আমার মনে হয়েছিল চেনা চেনা মুখ—কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি—

আমিত বম্বেতে কখনো থাকিনি।

না—তবে—

তবে?

আপনার ফটো দেখেছি কাগজে—

ফটো?

হ্যাঁ—কলকাতার বিখ্যাত সার্জন সমীর চৌধুরী, এফ-আর-সি-এস? বন্দনার গলা দিয়ে কথাগুলো বের হয়ে আসে, কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনুতে আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ—

জানি। আপনার সব কথাই জানি।

জানেন?

হ্যাঁ—আপনার বাবাও নামকরা একজন চিকিৎসক ছিলেন—ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী—

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি—

কিন্তু জয়ন্ত বোসকে আপনি খুন করেছিলেন কেন তাত বললেন না—

বললাম ত। আমার একমাত্র বোন সীতার ইজ্জত সে লুঠ করেছিল—that scoundrel—কিন্তু যাক সে কথা—এবার আমি যাবো—

কোথায় যাবেন? বন্দনা শুধায়।

জানি না কোথায়, শুধু জানি যেতে হবে এবং এই মুহূর্তে—

কিন্তু এমনি করে পালিয়ে পালিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কতদিন পারবেন—

কতদিন পারবো তা জানি না আর ধরাও হয়ত একদিন পড়বো—তারপর একটু থেমে সমীর বললে, আপনি বুঝবেন না—এইভাবে আত্মগোপন করে পালিয়ে পালিয়ে সত্যিই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এক এক সময় তাই ভাবি—ধরাই দিই। কিন্তু পারি না—যখনই আমার বোন সীতার কথা মনে পড়ে তখুনি মনে হয় ধরা দিলে তার কি হবে?

কেন? সীতা—আপনার বোনের কি হয়েছে।

তার দেহের উপর দিয়ে সে রাত্রে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তারপরই তার সম্পূর্ণ আত্মবিকৃতি আসে—amnesia—যতদিন না সুস্থ হয়ে সে ওঠে—তার চিকিৎসার খরচ আমি ছাড়া আর কে বহন করবে বলুন—আমি ছাড়া ত এ জগতে আমার সেই স্মৃতিভ্রংসা অভাগিনী বোনটির আর কেউ নেই। যাক্ শুনলেন ত সব কথা—এবারে আমি যাই—

বন্দনা চুপ করে থাকে।

মাস্টারজীও এতক্ষণ ওদের কথা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল।

ডকটর সাব্—শান্তাপ্রসাদ বললেন, এক বাত বলুঁ—

কেয়া মাস্টারজী?

আপ ইধারই রহিয়ে—

না, না—

আপনার কোন ডর নেই—এখান থেকে থানা চৌকি অনেক দূর —কেউ আপনার সন্ধান পাবে না—

তা হয় না মাস্টারজী—জেনে শুনে আপনাকে আমি বিপদের মধ্যে ফেলতে পারি না—

বিপদ—আমার আবার বিপদ কি ? আপ ফিকার না করিয়ে—

না। তাছাড়া পুলিশের তাড়া খেয়ে আমি জঙ্গলে ঢুকেছিলাম—ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের বাইরে এসে হঠাৎ একটা ট্রেন থামতে দেখে সেটায় উঠে এখানে আসি। সকলের অলক্ষ্যে ওয়েটিং রুমে—

সমীরের কথা শেষ হলো না বাইরে একটা গাড়ির তীব্র হেড-লাইটের আলো ঘরের জানালার উপর এসে পড়ে আবার সরে গেল।

বন্দনা তাড়াতাড়ি ছুটে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বললে, একটা জীপ মাস্টারজী—

একজন অফিসার তুজন সেপাই নামল জীপ থেকে—

সর্বনাশ। পুলিশ—

সমীর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকবার চেষ্টা করতেই শান্তাপ্রসাদ বললেন, ওদিক দিয়ে পালাবার কোন রাস্তা নেই ডকটর সাব্—হায় কিষণজী এ আমি কি করলাম—কেন একটু আগে ডাক্তার সাহেবকে যেতে দিলাম না—

বন্দনা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছে। চটপট তার পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলে সমীরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে, নিন—চটপট আপনার মুখ ও মাথা ব্যাণ্ডেজ করে আপনি বাবুয়ার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ুন—যান—আঃ কি করচেন—দেরী করবেন না আর—তাড়াতাড়ি করুন যা বলছি—

কিন্তু—

Please—সময় নষ্ট করবেন না—

পুলিশ অফিসার মিঃ সিংয়ের গলা শোনা গেল—দরজার গায়ে ধাক্কা পড়ল, মাস্টারজী, দরোয়াজা খুলিয়ে—

সমীর চটপট নিজের মাথা ও মুখ ব্যাণ্ডেজ করে নেয়—

লাল সিয়াই হ্যায় মাস্টারজী ? বন্দনা শুধায়।

হ্যাঁ—

জলদি লাইয়ে—

শান্তাপ্রসাদ একটা লাল কালির দোয়াত এনে দেন—বন্দনা তা থেকে লাল কালি সমীরের ব্যাণ্ডেজে লাগিয়ে দেয়—তারপর নিজের ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে নিজের সিঁথিতে ও কপালে লাল রং লাগিয়ে দিয়ে মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়।

'মাস্টারজী, দরোয়াজা খুলিয়ে—ম্যায় পুলিশ অফিসার সিং—

বন্দনাই তখন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কৌন—

ইন্সপেক্টার সিং—

কেয়া মাংগতে হে ইন্সপেক্টার সাব্—বন্দনা প্রশ্ন করে।

আপ কৌন হ্যায়—মাস্টারজী কিধার—

হাম উসিকো ভাতিজা--কাকা অন্দরমে হ্যায়—কেয়া, বোলাউ উসকো ?

সিং ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

শান্তাপ্রসাদ এবার এগিয়ে এসে বলেন, কেয়া বাত হ্যায় বিটি ? ইন্সপেক্টার সাব্ আয়া।

ইন্সপেক্টার সাব্—নমস্তে—ইতনি রাতমে—কেয়া বাত হ্যায় সাব্—

ইন্সপেক্টার শান্তাপ্রসাদের কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে শয্যায় ব্যাণ্ডেজবাঁধা শায়িত সমীরকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে, বিস্তারা 'পর লেটা হুয়া উয়ো কৌন হ্যায় ?

দামাদ।

দামাদ ?

হ্যাঁ—এই আমার ভাতিজা—ওরই স্বামী—আমার কাছে আসছিল গাড়িতে, পথে আসতে আসতে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে সন্ধ্যার সময়, গাড়ি ফেলে রেখে ওরা পায়ে হেঁটে কোনমতে আমার এখানে এসেছে—এসেই জ্বর হয়েছে—ধুম জ্বর—অজ্ঞান প্রায়—

কেয়া নাম ?

সুধাশংকর চৌবে।

কিধার রহেতে হে ?

পুনা—

ইন্সপেক্টার সিং একবার শায়িত সমীরকে দেখল, তারপর ঘরগুলো একবার দেখল, তারপর শান্তাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললে, I am sorry to disturb you at this late hour of night মাস্টারজী—

কোই বাত নেহি। লেকেন—বাত্ কেয়া হ্যায় ইন্সপেক্টার সাব্ ?

সুবে খবর মিলা থা এক কাতিল ভাগকে ইধার আয়া—

খুনী—

হাঁ—

কেয়া হোগা ইন্সপেক্টার সাব্—মুঝে ত বহুৎ ডর লাগতা হ্যায় আপকো বাত শুনকে—

ডরনেকো কুছ নেহি হ্যায়। হামলোক ত হ্যায়—

হাঁ—ওহি ত ভরসা—আপলোক হ্যায়—

আচ্ছা শান্তাপ্রসাদবাবু—চলতে হে—Good night, good night!

ইন্সপেক্টার সিং ঘর থেকে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বের হয়ে গেল।

শান্তাপ্রসাদ লোকটিকে ঐ তল্লাটে সকলেই চেনে—যেমন সৎ তেমনি সজ্জন ও ধর্মভীরু। কখনো মিথ্যা বলেন না।

বংশীলাল শান্তাপ্রসাদের কোয়ার্টারে ঢোকেনি। শান্তাপ্রসাদ যদি বুঝে ফেলে—তাছাড়া নিজেকে সে প্রকাশ করতেও চায়নি।

ডাক্তারখানায় সে গিয়েছিল এবং সেখান থেকেই সোজা স্টেশনে গিয়ে টেলিফোনে থানায় খবরটা দিয়েছিল, এবং ওদের আসা পর্যন্ত এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রাস্তার ধারে অন্ধকারে।

সিং বের হয়ে আসতেই অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলো বংশীলাল।

সাগ্রহে প্রশ্ন করল, কেয়া সাব্—মিলা?

ইনেসপেক্টর সিং প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় বংশীলালের গালে বসিয়ে কেবল বললে, বুদ্ধু—এবং বলে আর দাঁড়াল না, সোজা এগিয়ে গিয়ে জীপে উঠে ড্রাইভারকে বললে, চলো—

জীপটা স্টার্ট দিয়ে শব্দ তুলে চলে গেল।

বংশীলাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গালে হাত বুলোতে থাকে—ঐ ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড চড়ে গালটা তার তখনো টনটন করছে।

বন্দনা জানালাপথে উঁকি দিয়ে দেখছিল। জীপটা স্টার্ট দিয়ে চলে যাবার পর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললে, চলে গেছে—

শান্তাপ্রসাদ এগিয়ে এলেন, চলা গিয়া?

হ্যাঁ মাস্টারজী। বন্দনা বললে।

সমীরও ততক্ষণে শয্যা থেকে নেমে মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করেছে।

ঐ সময় বংশীলাল এসে ঘরে ঢুকল, মাস্টারজী, লিজিয়ে দাওয়া—বলতে বলতে বংশীলাল আড়চোখে সমীরের দিকে একবার—বন্দনার দিকে একবার তাকায়।

এতনা দের লাগায়া কিঁউ ভাই?

কেয়া করু মাস্টারজী, দাওয়াখানামে কমপাউণ্ডার নিদ পড়া—উঠনেই নেই চাতা—চিল্লাকে চিল্লাকে ত ম্যায় থাক্ গিয়া—

বংশীলাল শান্তাপ্রসাদের হাতে ঔষধের শিশিটা দিয়ে আর

একবার আড়চোখে সমীর ও বন্দনাকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ইন্সপেকটার সিংয়ের চড়ের আঘাতটার জ্বলুনি তখনো কমেনি।

সমীর শান্তাপ্রসাদের হাত থেকে ঔষধটা নিয়ে পরীক্ষা করে বাবুয়াকে জলের সঙ্গে কুড়ি ফোঁটা খাইয়ে দিল, তারপর বললে, মনে হয় মাস্টারজী এই ঔষধেই আপনার নাতি সুস্থ হয়ে উঠবে—সকালে আরো কুড়ি ফোঁটা ও দুপুরে কুড়ি ফোঁটা খাইয়ে দেবেন।

আপনি যে আমার কি উপকার করলেন ডকটর সাব্—আপনি না হঠাৎ এসে পড়লে যে আমার বাবুয়ার কি হতো—

বাবুয়া ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল ঔষধের গুণেই বোধহয়।

এবারে তাহলে আমি যাই মাস্টারজী—কথাটা বলে দরজার দিকে এগুতে যাবে সমীর, হঠাৎ ওর নজরে পড়ল সামনেই টেবিলের 'পরে একটা ভাঁজকরা সংবাদপত্র—তার পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুটো ফটো—

সমীর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল: ডাঃ শ্যামল রায়—প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সীতা চৌধুরী—তাঁর পত্নী—মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কলকাতায় তাঁদের বিবাহ হয়েছে।

কি—কি পড়চেন কাগজে? বন্দনাই শুধায়।

আঃ এতদিনে আমার মস্তবড় একটা দুর্ভাবনা গেল—

দুর্ভাবনা?

হ্যাঁ—আমার বোন সীতাকে শ্যামল বিয়ে করেছে—আর আমাকে পুলিশের তাড়া খেয়ে কুকুরের মত ছুটাছুটি করে বেড়াতে হবে না—আত্মগোপন করেও বেড়াতে হবে না—এবারে যদি তারা আমাকে ধরে ত ধরুক।

ধরা দেবেন? বন্দনা শুধায়।

হ্যাঁ—একটু আগেইত আপনাকে বলেছিলাম—এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি কেবল ঐ সীতার চিকিৎসার জন্যই—যদি কেবল জানতে পারতাম সে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ—

সীতা দেবী কো সাদী হো গিয়া ডকটর সাব্? শান্তাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ মাস্টারজী—

উন্‌নে আচ্ছা হো গিয়া।

এই সাত কুছ লিখা নেহি হ্যায় আকবর মে—স্রিফ উসাকা সাদী হো গিয়া হামারা এক দোস্তকে সাথ—এহি লিখা—

তা ডঃ সাব্ তোমার বোনকে কি ঐ লোকটা মানে জয়ন্ত বোস চিনতো—

হ্যাঁ—চিনত—

সমীর বলতে লাগল:

ঐ সীতা—আমার একমাত্র বোন। সীতা আমার চাইতে বার বছরের ছোট—ওকে জন্ম দিয়েই মা মারা যান—বাবাও মারা গেলেন তার আট বছর পরে। আমিই ওকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি মাস্টারজী—মেডিকেল কলেজের পড়া তখনো শেষ আমার হয়নি—তারপর আমি পাস করলাম—সীতা তখন কনভেণ্টে পড়ছে, তাকে কনভেণ্ট বোর্ডিংয়ে রেখেই আমি বিলেত চলে গেলাম—চার বছর বাদে বিলেত থেকে ফিরে এসে ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম—and that was my blunder মাস্টারজী—

কিঁউ?

প্র্যাকটিস জমানোর জন্য তখন আমাকে উদয়-অস্ত খাটতে হতো—হাসপাতাল—চেম্বার—সীতা একা থাকত বাড়িতে—যদি সে সময় তাকে বোর্ডিং থেকে না আনতাম তবে হয়ত তার জীবনের অতবড় calamityটা দেখা দিতো না—

calamity? শান্তাপ্রসাদ শুধান।

হ্যাঁ—সীতা সিনিয়র কেমব্রীজ পাস করে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছে—আর না পড়িয়ে তখন যদি তার একটা বিয়ে দিয়ে দিতাম একটি ভাল ছেলে দেখে—

॥ সাত ॥

হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সমীর প্রস্তুত হচ্ছিল—

বালিগঞ্জ অঞ্চলে ছোট একটি দোতলা বাড়ি—অনেকখানি জায়গা সামনে ও পিছনে খালি পড়ে আছে—

সমীরের বাবা ডাঃ সঞ্জয় চৌধুরী কলকাতার নামী ফিজিসীয়ান—দু'হাতে একসময় প্রচুর টাকা উপায় করেছেন।

সুখের সংসার—স্ত্রী বিনতা ও একটিমাত্র ছেলে সমীর।

বালিগঞ্জ সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে জায়গা কিনেছিলেন মনের মত একটা বাড়ি করবেন বলে—প্ল্যানও তৈরী—কিন্তু হঠাৎ কালো মেঘ সঞ্চারিত হলো।

দশ বৎসর পরে সন্তানসম্ভাবিতা বিনতা নার্সিং হোমে একটি কন্যার জন্ম দিয়েই চোখ বুজলেন।

সঞ্জয় চৌধুরী স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন—স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে যেন তিনি একেবারে জবুথবু হয়ে গেলেন।

প্র্যাকটিস পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন—মনের মত করে বাড়ি তৈরি করবেন বলে ভেবেছিলেন সে আর করা হলো না—কোনমতে ছোটখাটো একটা বাড়ি তৈরী করলেন।

আট বছর তারপর বেঁচেছিলেন—ছেলেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেছিলেন—সমীর তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে—দারুণ মেধাবী ছাত্র।

সঞ্জয় চৌধুরী শেষ শয্যায় ছেলেকে বলে গিয়েছিলেন সে যেন পড়া শেষ করে বিলাত যায়। মেয়েকে কনভেন্টে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

সমীর পাস করে বিলেত চলে গেল বোনকে কনভেন্ট বোর্ডিংয়ে রেখে।

দেশে ফিরে সমীর সীতাকে বাড়িতে নিয়ে এলো।

বোন সীতার বয়স আঠার তখন—সিনিয়র কেমব্রীজ পাস করে কলেজে ভর্তি হলো এবং বাড়ি থেকেই বাসে যাতায়াত করতে লাগল সীতা।

কনভেণ্টে মানুষ হওয়ার দরুণ সীতা অত্যন্ত অ্যাঙ্গলিসাইজড্ হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া অত্যধিক ভালবাসত এবং প্রশ্রয় দিত সমীর বোনকে।

সমীর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই বাঁধছিল পাশের ঘর থেকে সীতার গলা ভেসে এলো, দাদাভাই—

কি রে?

তুমি বেরুচ্ছো?

হ্যাঁ—কেন?

সীতা এসে ঘরে ঢুকল। পরনে স্ল্যাকস্ আর একটা হাফ শার্ট—বেণীটা বুকের 'পরে লুটোচ্ছে—উদ্ভিন্নযৌবনা।

আরশিতে বোনের ছায়া পড়ে—সমীর শুধায়, কিছু বলবি?

আজ আমরা কয়জন বন্ধু মিলে বটানিকস্-য়ে পিকনিকে যাচ্ছি—

কলেজ নেই তোর?

না—আজ ত ছুটি—

কিসের ছুটি?

আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপক গতকাল মারা গেছেন—

কখন ফিরবি?

ফিরতে হয়ত সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

কয়জন যাচ্ছিস?

দশ বার জন—

ঠিক আছে, টাকার দরকার হলে ড্রয়ারে টাকা আছে নিয়ে যাস—

সীতা চলে গেল গুনগুন করে একটা ইংরেজী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে—

ভৃত্য শংকর এসে ঘরে ঢুকল।

বহুকালের ভৃত্য শংকর—সমীর যখন পাঁচবছরের তখন শংকর এবাড়িতে এসেছে—

কোটটা হ্যাংগার থেকে নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে সমীর জিজ্ঞাসা করে, কিরে শংকরদা—কিছু বলবি?

তুমি ত সর্বক্ষণই দেখচি প্র্যাকটিস নিয়েই ব্যস্ত—

কি করি বল শংকরদা—সবে প্র্যাকটিসটা জমছে—

বেশ ত জমাও না, কিন্তু বোনটার দিকেও তাকাতে হবে ত।

সমীর হেসে ফেলে, তাকাচ্ছি না নাকি?

ছাই তাকাচ্ছো—এই যে কেবলই পিকনিক সিনেমা পার্টি করে বেড়াচ্ছে—

আহা ছেলেমানুষ—তাছাড়া এই ত জীবনটা উপভোগ করবার সময়—

বোনের বয়স হয়েছে ভুলে যেও না—ছেলেমানুষটি আর নেই—

না, না—কি এমন—

যা বলি শোন, ওর বিয়ের চেষ্টা দেখো এবারে একটা—

হবে হবে—ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

দেখো, তোমাকে একটা কথা বলি।

কি?

এ পাড়ার ঐ যে বিরাট বাড়ি—বোসরা না কি—

হ্যাঁ জনার্দন বোস—বিরাট বিজনেস—

তার একটা লক্কামার্কা বয়াটে ছেলে আছে জান—

কার কথা বলছিস? জয়ন্ত—

হ্যাঁ, হ্যাঁ—

তা কি হয়েছে তার—

ঐ ছেলেটার সঙ্গে সীতাকে দুদিন মার্কেটে—কয়েকদিন লেকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি—

তা হয়েছে কি ?

হয়েছে কি মানে ! ও ছেলেটা আদৌ ভাল নয়—আমি তোমায় বলে দিচ্ছি সীতা ওর সঙ্গে ঘোরাফেরা করে—ভাল না এটা !

সমীর মৃদু মৃদু হাসে। টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে তা থেকে সিগারেট কেসটার মধ্যে একে একে সিগারেট ভরতে থাকে।

আর সেই ভদ্রলোকের মেয়েকেই বা কতদিন ফেলে রাখবে ?

কোন্ ভদ্রলোকের মেয়েকে আবার ফেলে রাখলাম রে ? সমীর হাসতে হাসতে শুধায়।

কত্তাবাবুর বন্ধুর মেয়ে—বোম্বাইয়ে থাকে—যার সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে তোমার—নিয়ে এসো না তাকে এবারে বিয়ে করে—

দাঁড়া দাঁড়া—তুই যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আছিস শংকরদা—আগে সীতার একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিই তারপর সে সব কথা ভাবা যাবে—

তোমার খেয়ালখুশি মত বুঝি ?

তা নয়ত কি ! বিয়ে অমনি করবো বললেই ত হয় না—

আর তার মামা যদি অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়—তার বাপ ত আর বেঁচে নেই—

তা যদি দেয় ত আর কি করা যাবে—

কি করা যাবে মানে ! মেয়ের অত টাকা—সম্পত্তি—

শংকরদা—

কি ?

তুই এত লোভী !

লোভটা আবার কোথায় দেখলে—

তা নয়ত কি ! তাছাড়া একটা কথা তুই ভুলে যাসনে শংকরদা—

আমার সঙ্গে যখন বাবার বড়লোক ব্যারিস্টার বন্ধু তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা তখন কলকাতা শহরের একজন টপ ফিজিসিয়ান—হাজার হাজার টাকা ইনকাম করেন—আর এখন আমাদের কি আছে! সম্বলের মধ্যে ত এই বাড়িটা—আমিত ভাবচি এ অসবর্ণ বিয়ে হতে পারে না—আমি তাদের জানিয়ে দেবো।

কি জানিয়ে দেবে—

তারা যেন অন্য পাত্র দেখে—

জানিয়ে দেবে, আর কত্তাবাবুর কথাটা—

বাবাও নেই আর তাঁর বন্ধুও নেই—যাঁদের মধ্যে কথা হয়েছিল।

তারা না থাক তোমরা ত আছো—ওসব হবে না বলচি—ওসব মতলব ছাড়ো—

আচ্ছা আচ্ছা—এখন চলি—

জয়ন্তর মোটরে চেপে সীতা তখন চলেছে—জয়ন্ত ড্রাইভ করছে, পাশে বসে সীতা।

দাদাকে কি বললে? জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে ড্রাইভ করতে করতে।

পিকনিক।

তাই নাকি!

হুঁ।

তা পিকনিকটা কোথায়?

বটানিকসে—

তাহলে **let us go to Botanics**—

তা যেন হলো—ওদিকে যে দাদা পাত্র খুঁজছে—

বল কি! বাড়ির পাশেই এমন সোনার পাত্রটি তার চোখে পড়ল না!

দাদাকে ত জান—শুধু হাসপাতাল চেম্বার আর রোগী—একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং—

জয়—

উঁ—

দাদাকে বলবে না ?

হ্যাঁ—বলতেই হবে—

কবে ?

শীগ্‌গিরি।

সমীর গাড়ী চালাতে চালাতে ভাবছিল, সত্যিই এবারে সীতার একটা ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া দরকার।

শংকরদা ঠিকই বলেছে।

হাসপাতালে তার হাউস সার্জন ছেলেটি ডাঃ রণবীর মুখার্জী—ছেলেটি যেমন স্মার্ট তেমনি ব্রাইট। ক্যারিয়ারও ভাল।

হাসপাতালে ঢুকে গাড়ীটা পার্ক করে সমীর ইমারজেন্সীর সামনে দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

দোতলায় উঠতেই করিডোরে রণবীরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

একটা টেস্টটিউবে ব্লাড নিয়ে রণবীর ক্লিনিক্যাল রুমের দিকে যাচ্ছিল—

গুড মর্নিং স্যার—রণবীর বললে।

মর্নিং—১৩নং বেডের পেসেন্ট কেমন আছে রণবীর ?

ভাল না স্যার—

হিমাচুরিয়াটা বন্ধ হয়নি ?

না—

তাহলে কালকেই অপারেশনে দাও—

আপনি রাউণ্ড দেবেন ত স্যার ?

হ্যাঁ—তুমি ঘুরে এসো—আমি সার্জেনস্ রুমে আছি।

একটু পরে ওয়ার্ডে রাউণ্ড দিতে দিতে রণবীর ও সিস্টারকে নিয়ে সমীর একটা নতুন বেডের সামনে এসে দাঁড়াল, এ কবে ভর্তি হলো রণবীর ?

কাল সন্ধ্যায় স্যার—

কমপ্লেন কি ?

গ্যাসট্রাইটিস্—মনে হচ্ছে ডুডুন্যাল আলসার—

স্টমাক কনটেন্ট অ্যানালিসিসের জন্য পাঠাও—

কাল পাঠাবো স্যার—

ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শুধায় সমীর, আজ ক'টা অপারেশন রণবীর ?

একটাই স্যার—১২নং সেই ফিমেল কেসটা—গ্যাসট্রা জুজ্নোষ্টমি—

পেসেণ্টকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ?

বোধহয় স্যার—

চল থিয়েটারে যাওয়া যাক—

অপারেশন শেষ হতে হতে বেলা পৌনে ছুটো বেজে গেল।

অপারেশনের পর সার্জেন্স রুমে বসে কফি পান করতে করতে সমীর রণবীরকে প্রশ্ন করে, তারপর রণবীর কি ঠিক করলে ? বিলেত যাচ্ছো ত এফ-আর-সি-এসটা দেবার জন্য ?

আপনি ত জানেন স্যার আমাদের সংসারের অবস্থা—বাবার যা ইনকাম—

তুমি সব ব্যবস্থা করো রণবীর—টাকার জন্য ভেবো না—

ভাববো না ?

না—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আমি সব বলবো—you must go to England !

বাবার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন কেন স্যার ?

তাঁর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ আছে। তোমরা ত সেই শ্যামবাজারের বাড়িতেই আছো ?

না স্যার—মাস দুই হলো আমরা আগরপাড়ায় চলে গিয়েছি—

সেখানে গেলে কেন ?

বাড়িভাড়া অনেক কম—তাছাড়া গত মাসে বাবাও রিটায়ার করেছেন।

॥ আট ॥

সমীরের লণ্ডনের এক বন্ধু—সেও ডাক্তার—তবে লণ্ডনেই প্র্যাকটিস করেছে—আট বছর পরে কলকাতায় এসেছে তার মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

সে সেদিন সন্ধ্যায় সমীর যখন সবে চেম্বারে রোগী দেখা শেষ করেছে এমন সময় এসে হাজির।

সুরজিৎকে দেখে সমীর ভারি খুশি হয়। বলে, কবে এলে দেশে?

দিন দুই হলো—

একেবারেই ফিরে এলে নাকি?

ক্ষেপেচো! এদেশে ডাক্তারদের কোন স্কোপ নেই—তুমি যে কেন ফিরে এলে তা তুমিই জান।

স্কোপ তৈরি করে নেবার জন্য—হাসতে-হাসতে সমীর বললে।

পারবে?

জানি না ভাই পারবো কিনা—তবে চেষ্টাত করতে পারব—

কিছুই হবে না। কিছুই করতে পারবে না সমীর—এ দেশ প্রতিভার মূল্য দেয় না—দিতে জানে না।

সমীর হাসল।

তারপর সুরজিৎ এক সময় বললে, জান—

ডঃ গার্ডনার এখনো তোমার কথা বলেন।

তাই নাকি? বুড়ো কেমন আছে—

আগের মতই গোয়িং ষ্ট্রং—

তারপর এক সময় সুরজিৎ বললে—

চলো আজ রাত্রে কোথায়ও দুজনে ডিনার খাওয়া যাক।

সমীর প্রথমটায় যেতে রাজী হয়নি কিন্তু সুরজিৎ ছাড়েনি—এক-প্রকার জোর করেই তাকে একটা চীনা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল।

মৃদু আলোয় আলোকিত ঘর।

ডায়াসে একটি প্রায়-নগ্ন নর্তকী নানারূপ যৌন অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে গাইছে—গমগম করছে যেন হলটা।

কি খাবে বল? সুরজিৎ শুধায়—

তুমি খাবে খাও—আমি না—ও আর আমি খাই না—

বাঃ তাই কখনো হয়—লণ্ডনে ত বেশ চলত—

তা চলত—তবে এখানে চলে না—

কেন হে?

তুমি ত জান আমার একটি ছোট বোন আছে—

সীতা না কি যেন নাম তার—

হ্যাঁ—সে যদি জানতে পারে তার দাদাভাই ড্রিঙ্ক করে—

তাতে কি।

না হে—সে আমাকে শুধু ভালই বাসে না সুরজিৎ—সে আমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে—তাকে আমি সুখী দেখতে চাই।

Nonsense!

ও তুমি ভাই বুঝবে না। বোন ত তোমার নেই—ভাই বোনের সম্পর্ক যে কত মধুর কত সুন্দর তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বোন যেন আর দুনিয়ায় কারো নেই—আর তার ভাইয়েরা—

না সুরজিৎ তা নয়। ওকে যে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি—ও ত শুধু আমার বোনই নয় সন্তানের মত—ওকে—

কথাটা শেষ হলো না সমীরের হঠাৎ সে দেখতে পেল, হলঘরে এসে ঢুকল জয়ন্ত—সঙ্গে তিনটি তরুণী।

ওদের একটা টেবিলের পরের টেবিলেই এসে বসল।

বেয়ারাকে অর্ডার দিল—হুইস্কি সোডা তিনঠো—

সমীর চেয়ে দেখে জয়ন্ত বোস তার তিনটি তরুণীসঙ্গিনীকে নিয়ে হাসতে হাসতে মদ্যপান করছে।

তাদের মধ্যে একজন তরুণী বললে, জয়, তুমি নাকি আজকাল ডক্টর সমীর চৌধুরীর বোনের সঙ্গে খুব মাখামাখি করচো—

আঃ মিমি—জয়ন্ত বলে ওঠে হুইস্কি গ্লাসে সিপ দিয়ে, don't be jealous my darling—I am going to marry her.

তিনটি তরুণীই একসঙ্গে বলে ওঠে মত্ত হাস্যরোল কণ্ঠে, Really—

Why not ? After all she is more charming than all of you !

হি হি করে হাসির তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তিনজন।

সমীর যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে—ইচ্ছা করে উঠে যায়, কিন্তু টেবিলে বেয়ারা ততক্ষণে খানা সার্ভ করেছে—তাছাড়া সুরজিৎই বা কি ভাববে—

ওদিকে জয়ন্তর টেবিলে মদ্যপান সমানেই চলতে থাকে।

জয়ন্ত বলে, মিমি—darling—don't take any more—you will be knocked down.

Don't be silly, মিমি বলে উঠে, মিমি ঘোষ still can swallow a bottle—

অনেক রাত্রে ফিরে এলো সমীর।

পাশাপাশি দুটো ঘরে ভাই আর বোন থাকে। সীতার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে দেখে সমীর দরজা ঠেলে বোনের ঘরে ঢোকে।

শিয়রের কাছে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। সীতা বোধহয় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে ?

খোলা একটা বই তার বুকের 'পরে।

গভীর মমতায় বোনের ঘুমন্ত মুখখানির দিকে তাকাল সমীর।

ফুলের মত নিষ্পাপ মুখখানি।

কয়েকটি চূর্ণকুন্তল পাখার হাওয়াতে স্থানচ্যুত হয়ে কপোল ও কপালের উপর এসে পড়েছে।

গভীর স্নেহে আঙুল দিয়ে আলগোছে সন্তর্পণে চুলগুলি ঠিক করে দেয় সমীর—কিন্তু সেই সামান্য স্পর্শেই সীতার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কে ?

আমি—

দাদাভাই—

আলো জ্বেলে ঘুমোচ্ছিস কেন ? হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে বেড ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল সমীর।

দাদাভাই—

কি রে ?

এত দেরি করে ফিরলে—খেয়েছো ?

আমি খেয়ে এসেছি রে। তুই ঘুমো—

সমীর তার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিনই সকালে ব্যাপারটা ঘটল।

সকালে সমীর হাসপাতালে বেরুবে বলে প্রস্তুত হয়েছে শংকর এসে ঘরে ঢুকল।

সমীর—

কিরে শংকরদা—

জয়ন্ত বোস এসেছে—

কে ?

বোস বাড়ির সেই ছেলেটা—

সীতা কোথায় ?

সে ত বাথরুমে—জয়ন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

সমীর যেন কি ভাবল, তারপর বললে, হুঁ, ঠিক আছে, তুই যা—আমি আসচি।

সমীর যখন ড্রয়িং-রুমে এসে ঢুকল, একটা সোফার পরে পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিয়ে জয়ন্ত সিগ্রেট টানছিল।

সমীরের পদশব্দে সিগারেটটা হাতেই উঠে দাঁড়াল, ডক্টর চৌধুরী, আমি একটা proposal নিয়ে এসেচি আপনার কাছে।

কিসের প্রোপোজাল ?

ভ্রূ বেঁকিয়ে সমীর তাকাল।

আপনি হয়ত জানেন না—বিজনেস ম্যাগনেট জনার্দন বোসের ছেলে আমি—আমার নাম জয়ন্ত বোস—

জানি। কিন্তু প্রোপোজালটা কি ?

Well! I want to marry your sister!

কিন্তু তা ত সম্ভব নয় জয়ন্তবাবু—

কেন ?

কারণ তার বিয়ে আমি আগেই অন্যত্র স্থির করেচি।

ওঃ—তা আপনার বোন জানে সে কথা ?

না—

জানে না ?

না—ঠিক সময় মতই তাকে জানানো হবে—আর কিছু আপনার বলবার আছে জয়ন্তবাবু ?

আপনি তুটো কথা ভুলে যাচ্ছেন ডঃ চৌধুরী—

কি বলুনত ?

প্রথমতঃ সে নাবালিকা—আর—

আর ?

সে আমাকে ভালবাসে। কাজেই—

বলুন—থামলেন কেন ?

আমাদের বিয়ে আপনি আটকাতে পারবেন না।

বেশত—যদি না আটকাতে পারিই—বিয়ে করবেন তাকে।

জয়ন্ত সমীরের মুখের দিকে অতঃপর ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলো।

তাহলে এইটাই আপনার শেষ কথা—

হ্যাঁ—আসুন—নমস্কার—

জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায়—হাতের অর্ধদগ্ধ সিগ্রেটটা অ্যাশট্রেতে স্ম্যাশ করে সমীরের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল—

জয়ন্তবাবু, শুনুন—

জয়ন্ত ঘুরে দাঁড়াল।

অতঃপর আমার বোন সীতার সঙ্গে আপনি মেশার না চেষ্টা করলেই খুশি হবো—

জয়ন্ত কোন জবাব দিল না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জয়ন্ত সোজা গেল একটা বারে।

হুইস্কির অর্ডার দিল।

বেলা বারটা পর্যন্ত একটানা ড্রিংক করে চলল—তার মধ্যেই একসময় উঠে গিয়ে বন্ধু কপিল দত্তকে ফোন করে এলো লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জানিয়ে।

বেলা একটা নাগাদ কপিল যখন এলো তখনো সমানে ড্রিংক করে চলেছে জয়ন্ত।

কি রে—এই ভরদুপুরে হুইস্কি খাচ্ছিস কেন? কপিল পাশের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললে।

কপিল—

কি ব্যাপার?

That swine insulted me.

কে? কার কথা বলচিস? কে আবার তোকে insult করলো?

That স্কাউণ্ড্রেল ডক্টর সমীর চৌধুরী—

তোর সেই ফিঁয়াসে সীতার দাদা—

Yes!

কিন্তু কেন?

জয়ন্ত তখন ব্যাপারটা ড্রিঙ্ক করতে করতেই জড়িত-গলায় বলে গেল, আমি সীতাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদাই দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঐ সমীর চৌধুরী—that imp of a Satan—

একটা কথা বলব জয়ন্ত?

কি?

বলছিলি না সীতা তোকে ভালবাসে—

নিশ্চয়ই—

তবে? সীতার সঙ্গে দেখা কর না—

না।

তবে?

ওকে আমি একটা ভাল lesson দিতে চাই—

Lesson?

Yes! Would you help me?

তুমি ত জান ব্রাদার I am always with you! কিন্তু—

কপিল, তুই ভাবিস না—বাবাকে বলবো তোর প্রোমোশনের জন্য—বলতে বলতে জয়ন্ত পকেট থেকে কয়েকটা একশোটাকার নোট বের করে বললে, এগুলো রাখ—

কপিল দত্ত কোনরকম দ্বিধা করে না, মৃদু হেসে নোটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে দেয় টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে।

হুইস্কির গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বলে, Now listen my plan.

॥ নয় ॥

সীতা আর্গানে একটা গানের সুর তোলার চেষ্টা করছিল কিন্তু পারছিল না। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে—আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, বোধকরি বৃষ্টি নামবে।

সমীর সেদিন একটু সকাল সকালই চেম্বার থেকে ফিরেছিল। মনটাও তার খুশি—ঐ দিনই দুপুরে আগরপাড়ায় রণবীরের বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে কথা বলে এসেছে।

রণবীরের বাবাত হাতে স্বর্গ পেয়েছেন।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কানে এলো সীতা আর্গানে গানের সুর তোলার চেষ্টা করছে।

সমীর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গেয়ে ওঠে গানটা :

মনে হলো পেরিয়ে এলেম অসীম পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।

দাদাভাই—শীগ্‌গিরি এসো—চিৎকার করে ওঠে সীতা।

কি হলো রে ?

শীগ্‌গিরি এসো—

হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকল সমীর, কি হলো—

হচ্ছে না—

কি হচ্ছে না—

গানটা আমাকে ঠিক করে দাও—লক্ষ্মীটি—

সমীর বোনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার বেণীটা ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, সর—ওঠ—

সীতা উঠে দাঁড়াল। সমীর অর্গানের সামনে বসে সুর দিল, নে গা—

মনে হলো পেরিয়ে এলেম অসীম পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
সীতা সমীরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গায়—গায় দুজনে—
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্ত যূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।

বাইরে তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে।

গান শেষ হলে সমীর ডাকে, সীতা—

কি দাদাভাই ?

আমার হাউস সার্জন রণবীরকে তোর কেমন লাগে ? Isn't he very bright ?

বড্ড shy !

সমীর বললে, ভাল করে আলাপ হলে দেখবি সত্যিই ভাল ছেলেটি। ওকে ভাবচি একদিন আমাদের বাড়িতে রাত্রের ডিনারে ডাকবো। কি বলিস ?

বেশ ত।

সেদিন তোর সেই মাংসের স্পেশাল ঝাল কারিটা খাইয়ে দিবি ! কেমন—

যদি নিন্দে করে তোমার হাউস স্টাফ—

নিন্দে অমনি করলেই হলো ! খেয়েছে নাকি অমন ডিস্ কোনদিন—

সবাই দাদাভাই নয়—

না, না—দেখিস ও ঠিক প্রশংসা করবে—

দাদাভাই—হঠাৎ বললে সীতা ?

কি রে ?

একটা কথা তোমাকে বলবো ?

কি—বল না।

না—এখন থাক—

কেন, বল না—

না—পরে—সীতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরের দিন নার্সিং হোমে একটা জরুরী অপারেশন ছিল—তাই আর চেম্বারে যেতে পারেনি সমীর, সোজা ড্রাইভ করে বাড়ি চলে এসেছিল।

সন্ধ্যে তখন প্রায় পৌনে সাতটা—

তাছাড়া ঐদিন সকালে সমীর বোনকে কথা দিয়েছিল নাইট শোতে বোনকে নিয়ে সিনেমা যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকতেই শংকর এসে দাঁড়াল।

সীতা কোথায় রে শংকরদা, তাকে রেডি হতে বল।

সীতা ত নেই।

নেই! কোথায় ?

এখনোত ফেরেইনি সে কলেজ থেকে।

এখনো ফেরেনি মানে—

সমীর যেন একটু চিন্তিতই হয়, হয়ত কলেজ থেকে কোথায়ও গিয়েছে—

কিন্তু আমাকে সে বলে গিয়েছিল চারটের পর সে বাড়ি ফিরে আসবে—তার এক বন্ধুকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিল, সে এতক্ষণ বসে থেকে থেকে একটু আগে চলে গেল।

তোকে বলে গিয়েছিল চারটের পর ফিরবে ?

হ্যাঁ—আমার ভাল ঠেকছে না সমীর—তুমি বরং একবার কলেজে খোঁজ নাও—

কলেজ ত কখন ছুটি হয়ে গিয়েছে—

হঠাৎ ঐসময় পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে রিসিভারটা তুলে নিল সমীর, ডক্টর চৌধুরী স্পীকিং—

ডক্টর চৌধুরী—শুনুন আমি ব্যারাকপুর থেকে বলছি—

বলুন—

আপনার বোন সীতা—

সীতা।

হ্যাঁ—তাকে জয়ন্ত বোস কলেজ থেকে তার গাড়িতে তুলে নিয়ে তার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে গিয়েছে—

কি? কি বললেন—

বোনের ইজ্জত যদি বাঁচাতে চান ত আর দেরি করবেন না—ব্যারাকপুর স্টেশনের আগেই গঙ্গার ধারে নীলকুঠি নামে জনার্দন বোসের যে বাগানবাড়িটা আছে জয়ন্ত সীতাকে সেইখানেই নিয়ে গেছে—

কে—কে আপনি?

আমার নাম জানার দরকার নেই আপনার—বোনকে বাঁচাতে চান ত আর দেরি করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের কনেকশন কেটে গেল অন্য প্রান্তে।

হ্যালো—হ্যালো—ট্যাপ করে সমীর কিন্তু অন্য প্রান্তে—ফোন তখন ডেড।

সমীরের মাথার মধ্যে যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

শংকরকেও কোন কথা বলবার সময় পায় না—ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দেয়।

ঝড়ের বেগেই যেন সমীর গাড়ি চালায়।

সাদার্ন অ্যাভিন্যু থেকে গোলপার্ক হয়ে রাসবিহারীর মোড় ক্রস

করে গড়িয়াহাটায় পড়ে—পার্ক সার্কাস থেকে সুন্দরীমোহন রোড ধরে—সার্কুলার রোড ধরে বহুবার অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে বাঁচাতে যখন সমীর শ্যামবাজারের মোড় পার হয়ে—ব্রীজ পার হয়ে বি. টি. রোডে পড়ল রাত তখন পৌনে আটটা।

সিঁথির মোড় বরাহনগর পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবার বাঁয়ের রাস্তা ফেলে ডানলপ ব্রীজ যখন পার হলো তখন রাত প্রায় সোয়া আটটা।

বেলঘরিয়া—আগড়পাড়া—টিটাগড়—রাত সোয়া নয়টা প্রায়—

বাইরে তখন আবার ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে নিকষকালো।

যখন ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছল সমীর গাড়ি নিয়ে নীলকুঠি খুঁজে পেতে তার দেরি হলো না—ঐ অঞ্চলের এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতেই সেই পথ বলে দিল।

গঙ্গার ধারে একেবারে নীলকুঠি।

অনেকখানি বাগান নিয়ে একটা ডাকবাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

বাড়ির রংটা নীল বলে স্থানীয় লোকেরা বলত ওকে নীলকুঠি।

জয়ন্তর বাবা জনার্দন বোস মধ্যে মধ্যে কলকাতার বাইরে এসে নিরিবিলিতে দু'চার দিন কাটানোর জন্য গঙ্গার ধারে ঐ বিশ্রামগৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। ইদানীং তিনি বড় আর আসতেন না—জয়ন্তই মধ্যে মধ্যে বান্ধবী নিয়ে এসে ওখানে স্ফূর্তি করত।

কেয়ারটেকার একজন ছিল বাড়িটার—এক ওড়িয়া—নিতাইচন্দ্র।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই পথের দু'পাশে কয়েকটা বিরাট বিরাট ঝাউগাছ—বৃষ্টি তখন বেশ পড়ছে।

বাড়ির সামনেই জয়ন্তর ইম্‌পোর্টেড নতুন ঝকঝকে ফিয়াট গাড়িটা নজরে পড়ল।

কাচের জানালার ভিতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল।

গাড়িটা থামিয়ে সমীর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এদিক ওদিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় সমীর।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

মেঘাবৃত আকাশ।

মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

মালী বা কেয়ারটেকার কাউকেই সমীর আশে পাশে কোথায়ও দেখতে পেল না।

চারদিকে ঘোরান বারান্দা। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

বারান্দায় উঠে যে ঘরে আলো জ্বলছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সমীর।

সমীর দরজায় ধাক্কা দিল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

বার বার ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজা খুলল না। সমীর অস্থির হয়ে ওঠে—

বারান্দার দিককার জানালার কাচ দিয়ে ঘরের ভিতরের যেটুকু নজর পড়ে কিছুই দেখতে পায় না। সমীর এবারে বারান্দা দিয়ে ঘুরে ঘরের পিছন দিকে গেল। পিছনের কাচের জানালা পথে ভিতরে আবার উঁকি দিল।

তখুনি ঘরের মধ্যে নজরে পড়ল তার সীতা আর জয়ন্তকে—এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে ওঠে সমীর।

মেঝেতে গোটা দুই বোতল ও গ্লাস গড়াগড়ি দিচ্ছে।

সীতার সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র বিস্রস্ত—গায়ের ব্লাউজ ছিঁড়ে গিয়েছে —জয়ন্ত তাকে জোর করে ধরে খাটের উপরে নিয়ে গিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে—সীতা প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

সমীরের মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে যায়। সে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসাল কাচের জানালায়—ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙ্গে গেল আর সীতার চিৎকার শোনা গেল—না, না—জয়ন্ত না—

ততক্ষণে জয়ন্ত সীতাকে চিত করে ফেলেছে খাটের উপরে—জানালার ছিটকানি খুলতে প্রায় মিনিট পাঁচ সাত লাগল সমীরের—জানালার পাল্লা খুলে—ভাগ্যে কোন শিক বা গ্রিল ছিল না জানালায়—সমীর লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে।

জয়ন্ত ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে—সীতার জ্ঞান হারিয়েছে—ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতই সমীর জয়ন্তর উপরে—কিন্তু জয়ন্তর শরীরেও কম শক্তি ছিল না—সে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সমীরকে তারপরই পকেট থেকে পিস্তল বের করল, সমীর চৌধুরী—যে পথে এসেছো সে পথে বের হয়ে যাও—নচেৎ কুকুরের মত গুলি করে মারব তোমাকে।

সমীর মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় বুঝি।

অদূরে শয্যার উপর এলায়িতা প্রায়-উলঙ্গ সীতার নিশ্চল দেহটা চোখে পড়ে সমীরের—জয়ন্তও বোধহয় তাকিয়েছিল মুহূর্তের জন্য সেই দিকে—আর মুহূর্তটুকুর সুযোগেই আবার সমীর জয়ন্তর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দু'হাতে জাপটে ধরল।

ধস্তাধস্তি শুরু হয় আর তারই মধ্যে সমীর জয়ন্তর হাত থেকে তার পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়—

জয়ন্ত সমীরকে দু'হাতে আবার জাপটে ধরে—ধস্তাধস্তির মধ্যেই ফায়ারিং হয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার করে জয়ন্ত মেঝের 'পরে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময় কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র ভাঙ্গা জানালাপথে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল।

সে চিৎকার করে ওঠে, খুন—খুন—

সমীর বিমূঢ়—পাথর—

নিতাই ঘরের দরজাটা খুলে 'খুন' 'খুন' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল।

সমীর ততক্ষণে যেন তার সংবিৎ ফিরে পেয়েছে।

ছুটে গেল খাটের কাছে সমীর—সীতা তেমনি পড়ে আছে তখনো শয্যার উপরে—প্রায় বিবস্ত্রা—জ্ঞান নেই তার।

মুহূর্ত দেরী না করে সমীর সীতার অচেতন দেহটা তার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে ভাল করে ঢেকে নিজের কাঁধের উপর তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

বাইরে এসে গাড়ির দরজা খুলে ব্যাক সীটে সীতার অচেতন দেহটা শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

॥ দশ ॥

পথেই একসময় সীতার জ্ঞান ফিরে এলো।

সীতাকে উঠে বসতে দেখে সমীর গাড়ি থামিয়ে তাকে সামনের সীটে তার পাশে এনে বসিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন।

অন্ধকারে ও বৃষ্টির ঝাপটায় সামনের রাস্তা কিছুই দেখা যায় না।

সচল ওয়াইপার গাড়ির সামনের কাচটাকে কেবল আরো ঝাপসা করে তোলে।

সীতা—

কোন সাড়া দেয় না সীতা।

সীতা—শীত করছে—সমীর আবার শুধায়।

কোন সাড়া নেই সীতার।

সে যেন কেমন ফ্যালফ্যাল করে সামনের দিকে চেয়ে আছে। প্রাণহীন একটা পুতুলের মত।

এই সীতা—কথা বলছিস না কেন?

সীতা যেন প্রস্তরমূর্তির মত বসে আছে। যেন দেহে ওর প্রাণ নেই—

গাড়ি থামাল সমীর রাস্তার এক পাশে।

সীতা—এই সীতা—

সীতা কেমন আগের মতই ফ্যালফ্যাল করে সমীরের মুখের দিকে তাকায়।

সে দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই—বোবা দৃষ্টি।

সমীর দু'হাত বোনের কাঁধের উপর রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, এই সীতা—সীতা—

সীতা তবু নীরব।

এই সীতা, কথা বলছিস না কেন? সীতা!

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে তখনো।

অমন করে চেয়ে আছিস কেন—এই সীতা! আমাকে কি তুই চিনতে পারচিস না—আমি—আমি রে—দাদাভাই—

না। তবু সীতা নীরব। যেন পাথর। প্রাণহীন একটা পাথরের পুতুল যেন।

ডাক্তার সমীরের বুঝতে কষ্ট হয় না আর যে নিদারুণ মানসিক আঘাতেই সীতা বোবা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন সমীর কি করবে?

সে যে ভেবেছিল সীতাকে নিয়ে সে দূরে অনেক দূরে কোথায়ও চলে যাবে।

কিছুক্ষণ আগেকার ঘরের ভিতরের সেই বীভৎস দৃশ্য! রক্তের স্রোতের মধ্যে পড়ে আছে জয়ন্তর প্রাণহীন দেহটা—কেয়ারটেকারটার সেই 'খুন খুন' চিৎকার।

এতক্ষণে হয়ত সে পুলিশ ডেকে এনেছে। পুলিশ হয়ত তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে।

কেমন আতঙ্কিত দৃষ্টিতে গাড়ির পশ্চাতের কাচ দিয়ে তাকাল পথের দিকে সমীর।

একটা গাড়ির হেডলাইট। বৃষ্টির ঝাপসার মধ্যেও আলোটা বহুদূর থেকে দেখতে পেল সমীর।

সমীর তাড়াতাড়ি গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল।

টপ স্পীডে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

গাড়ি চালাতে চালাতেই সমীর চিন্তা করে—

কোথায় যাবে সে এখন! বাড়িতে গেলে পুলিশ হয়ত সেখানে গিয়ে হাজির হবে। তাকে যদি ধরে নিয়ে যায় সীতার কি হবে!

চিন্তার আবর্ত মাথার মধ্যে চলতে থাকে সমীরের।

হঠাৎ—হঠাৎই মনে পড়ে সমীরের বন্ধু শ্যামলের কথা। তার পরিচিত ডাক্তার শ্যামল রায় মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ।

আয়রন সাইড রোডে তার চেম্বার ও ছোটখাটো একটি নার্সিং হোম।

ঐ বাড়িতেই তিনতলায় দুটো ঘর নিয়ে ডাঃ শ্যামল থাকে।

সোজা গাড়ি চালিয়ে শ্যামলের নার্সিং হোমেই গেল সমীর।

ক্রমশঃ বৃষ্টি তখন থেমে এসেছে।

রাত তখন বোধহয় তিনটে।

কলিং বেল টিপতেই দরোয়ান দরজা খুলে দিল।

বাহাদুর—

জী!

ডাক্তার সাহেবকে এখুনি একবার খবর দাও—

আইয়ে বৈঠিয়ে—আভি হাম খবর দেতেহে—

বাহাদুরের অপরিচিত নয় সমীর। ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বাহাদুর সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল।

একতলায় চারখানা ঘরে চেম্বার, ট্রিটমেণ্ট রুম ও সিটিং রুম এবং শ্যামলের নিজস্ব লাইব্রেরী।

দোতলায় চারটে কেবিন ও সিসটারের থাকবার জায়গা।

তিনতলায় থাকে শ্যামল। এখনো বিয়েথা করেনি। একটি কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে—নারায়ণ।

সমীর অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল—একটা স্লিপিং গাউন গায়ে জড়িয়ে পায়ে চপ্পল শ্যামল এসে ঘরে ঢুকল।

শ্যামলের বয়েস সমীরের চাইতে দু'এক বছর বোধহয় বেশীই হবে।

সমীর—কি ব্যাপার—এত রাত্রে!

শ্যামল, আমি ভয়ানক একটা বিপদে পড়েছি ভাই—

বিপদ?

হ্যাঁ আমার বোন সীতা—

কি হয়েছে সীতার ?

হঠাৎ একটা মেণ্টাল শকে সে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে—

মেণ্টাল শক ?

হ্যাঁ—শ্যামল, সব কথা বলবার এখন আমার সময় নেই। জয়ন্ত বোস নামে একটা স্কাউণ্ড্রেল ওকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাগান-বাড়িতে—and he raped her.

সেকি !

একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার সেখানে পৌঁছতে—কিন্তু ততক্ষণে—

তাকে তুমি spare করলে।

না করিনি—he is dead !

Dead !

হ্যাঁ—বুঝতেই পারচো পুলিশ হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাকে—আমার জন্য আমি ভাবি না—ভাবচি আমি সীতার কথা—

তোমার বোন কোথায় ?

গাড়িতে বাইরে—

যাও যাও নিয়ে এসো শীগ্‌গিরি—

সমীর বের হয়ে গেল—গাড়ির মধ্যে তখনো ঠিক তেমনি পাথরের মত বসে আছে সীতা।

সীতা—আয়—

কিন্তু সমীরের ডাকে এবারও সীতা কোন সাড়া দিল না।

সমীর সীতাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এলো।

শ্যামল—

এসো এসো—ওকে আমার কনসালটিং রুমে নিয়ে চল।

কনসালটিং রুমে নিয়ে গিয়ে শ্যামল সীতাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে সমীরকে বললে, You wait outside সমীর—

সমীর বের হয়ে গেল।

আধঘণ্টা বাদে শ্যামল বের হয়ে এলো, সমীর, you are right —mental shock—কথাই শুধু বন্ধ হয়ে যায়নি probably she has lost her memory!

Lost her memory—you mean amnesia?

I am afraid সমীর, মনে হচ্ছে সেই রকমই।

কি হবে শ্যামল?

কিছু ভেবো না—ভাল হয়ে যাবে—তবে সময় লাগবে—

সীতা—সীতা ভাল হবে ত শ্যামল?

নিশ্চয়ই—she requires now mental rest and treatment.

তাহলে ওকে তোমার এখানেই রাখ—

বেশ ত!

টাকার জন্য তুমি ভেবো না শ্যামল, আমি টাকার ব্যবস্থা করব—

তুমি ত জান সমীর আমার অবস্থা—এই নিজস্ব নার্সিং হোম চালাতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছি আমি। তাছাড়া এসব চিকিৎসা বড্ড খরচের ব্যাপার—নচেৎ তোমার বোন—

না, না—টাকা আমি দেবো—তুমি শুধু ওকে all possible treatment দিয়ে ভাল করে তুলবে—টাকার জন্য তুমি ভেবো না—

ও তাহলে—

আমার এখানেই থাক—একটা কেবিন আমার খালিও আছে—

আমি বাড়ি যাচ্ছি এখুনি—কিছু টাকা এবং ওর জামা কাপড় এনে দিচ্ছি—

তাই যাও—

সমীর ছুটলো এবারে বালিগঞ্জে।

আকাশে মেঘ থাকলেও ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পেতে তখন শুরু করেছে।

শংকর জেগেই ছিল।

সে শুধায়, কি হলো—সীতা কই ?

আছে—তার এক বন্ধুর বাড়িতে—কোনমতে কথাগুলো বলে সমীর গিয়ে তার বেডরুমে ঢুকল—আলমারি খুলে যা টাকা ছিল সব নিল—একটা স্যুটকেসে সীতার কিছু জামা কাপড় ভরে নিল—

বেরুতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা সমীরের মনে হয়—তারও বোধহয় এখন কিছুদিন গাঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল—কারণ সীতার চিকিৎসার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হবার আগেই যদি পুলিশ তাকে ধরে তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

সমীর তাড়াতাড়ি একটা ছোট অ্যাটাচীকেসে তার দু'চারটে জামা কাপড় ভরে নিল তারপর ডাকল, শংকরদা—

শংকর এলো।

কয়দিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি—

কোথায় ?

এখনো জানি না ঠিক কোথায় তবে একটা জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে—সীতাও এখন কিছুদিন তার বন্ধুর বাড়িতেই থাকবে।

একটানা কথাগুলো বলে শংকরকে কোন কথা বলবার অবকাশ-মাত্রও না দিয়ে শংকরের পাশ কাটিয়ে সমীর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সোজা গেল সমীর শ্যামলের ওখানে।

তার হাতে দেড় হাজার টাকা দিয়ে বললে, দু'চার দিনের মধ্যেই আবার সে এসে কিছু টাকা দিয়ে যাবে—

সমীর গাড়িতে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কিন্তু এখন সে কোথায় যাবে ?

এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

একবার ভাবল সমীর যতদূর যাওয়া যায় গাড়ি চালিয়ে সে চলে যাবে—আপাততঃ কলকাতার বাইরে—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনে হয়—পুলিশ তাকে অনুসন্ধান করে বেড়াবেই—সে ক্ষেত্রে কতদিন আর সে পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয় সমীরের—সঙ্গে সঙ্গে সে ময়দানের এক পাশে গাড়িটা থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

এবার চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটতে লাগল, সমীর গিয়ে উঠ্‌লো একটা নামকরা হোটেলে।

তিনটে দিন কোথায়ও সে বের হলো না হোটেল থেকে।

দ্বিতীয় দিন সকালে সংবাদপত্রে নীলকুঠিতে জয়ন্ত বোসের মৃত্যুসংবাদটা ওর চোখে পড়ল।

পুলিশ তার গাড়িটা ময়দানের ধারে পার্ক করা অবস্থায় পেয়েছে এবং ওকেই জয়ন্ত বোসের হত্যাকারী সন্দেহে—ওর খোঁজে ওর বাড়িতে গিয়ে হানা দিয়েছিল। এবং এখন সর্বত্র ওর খোঁজ করছে।

পুলিশ তাহলে তাকেই সন্দেহ করেছে হত্যাকারী বলে।

সর্বত্র তার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে পুলিশ।

তারপর একটা দিন একটা রাত চিন্তা করল সমীর।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যারাত্রে বেয়ারাকে ডেকে হোটেলের বিল মিটিয়ে দিল—রাত দশটায় সে ঘর ছেড়ে দেবে।

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে সমীর আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কয়দিন সেভ করেনি—সারা মুখে দাড়ি গজিয়েছে।

॥ এগার ॥

রাত্রি তখন বোধহয় দশটা পঁয়তাল্লিশ হবে।

হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী কালকা মেল ছেড়েছে কিছুক্ষণ আগে।

বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ফার্স্ট ক্লাস একটা কম্পার্টমেণ্ট। ফোর বার্থ কম্পার্টমেণ্ট।

চারজন যাত্রী।

উপরের বার্থে দু'জন অঘোরে ঘুমোচ্ছে—উঠেই তারা শুয়ে পড়েছিল।

নীচের বার্থে দু'জন যাত্রী। দুজনেই জেগে।

একজন মধ্যবয়সী এক গুজরাটী ভদ্রলোক—নাম পুরুষোত্তম দাস —একটা ম্যাগাজিনের মধ্যে ডুবে আছেন—বিজনেস্ ম্যান।

বয়েস পঞ্চাশের উর্ধ্বেই বলে মনে হয়। নাদুসনুদুস চেহারা। আমেদাবাদের কোন এক কাপড়ের কলের ম্যানেজিং ডাইরেকটার।

অন্যজন এক পাঞ্জাবী যুবক।

মুখে চাপ দাড়ি—চোখে চশমা—মাথায় পাগড়ি।

বর্ধমান ছাড়াবার পর গুজরাটী ভদ্রলোক হাতের ম্যাগাজিনটা মুড়ে পাঞ্জাবী যুবকটির দিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, How far you will be going ?

দিল্লী।

দিল্লীমে কোই কামকে লিয়ে যা রহে হে ?

হ্যাঁ—থোড়া বিজনেস প্রোপোজাল হ্যায়—

পাঞ্জাবী যুবকটির হাবভাব দেখে মনে হয় সে যেন আলাপ করতে চায় না।

অ্যাটাচীকেস খুলে একটা বই বের করে সেটার পাতায় মনোনিবেশ করল।

পুরুষোত্তম দাস নিজের বার্থে শুয়ে পড়ে।

সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ট্রেন মোগলসরাই জংশনে এসে পৌছল।

পাঞ্জাবী যুবকটি গাড়ি থেকে নেমে গেল।

একটা সংবাদপত্র পেলে হতো।

স্টলে গিয়ে একটা সংবাদপত্র কিনল—পাতা ওলটাতেই তৃতীয় পৃষ্ঠায় নজরে পড়ল।

সমীর চৌধুরীর ফটো বের হয়েছে—

পলাতক খুনী আসামী সমীর চৌধুরী।

জনার্দন বোস দশ হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেছেন যদি কেউ তাঁর ছেলের হত্যাকারীর সংবাদ দিতে পারে বা ধরিয়ে দিতে পারে।

ঐ সঙ্গে আরো সংবাদ বের হয়েছে—তার সাদার্ন অ্যাভিন্যুর বাড়িতে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। ডাঃ সমীর চৌধুরী ও তার বোন সীতা চৌধুরীকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায়ও।

পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন সংবাদ পায়নি এখন পর্যন্ত। তবে তার গাড়িটা ময়দানের সামনে পাওয়া গিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ : যে দুর্যোগের রাত্রে ব্যারাকপুরের নীলকুঠিতে প্রখ্যাত শিল্পপতি জনার্দন বোসের একমাত্র পুত্র নিহত হয় পিস্তলের গুলিতে।

সেই রাত্রে স্যুটপরিহিত এক যুবক ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে এক স্টেশনারী দোকানের মালিক রসময় কুণ্ডুকে নীলকুঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কোথায় নীলকুঠিটা। রসময় কুণ্ডু ডাঃ সমীর চৌধুরীকে চিনতে পেরেছিল কারণ কিছুদিন আগে হাসপাতালে তার

কন্যার অ্যাপেনডিসাইটিস্‌ অপারেশন করেছিল সমীর চৌধুরী। ডাঃ সমীর চৌধুরীর গাড়িটাও রসময় কুণ্ডু সনাক্ত করেছে।

নীলকুঠির কেয়ারটেকারের কাছেও যে বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাতেও প্রমাণিত হয় যে ডাঃ সমীর চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নয়—কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র ডাঃ সমীর চৌধুরীর গাড়ির নম্বরটাও মনে রেখেছিল।

তারপর ঐ রাত্রি থেকেই সমীর চৌধুরী নিরুদ্দেশ।

ভৃত্য শংকর অবিশ্যি বলতে পারেনি কোথায় গিয়েছে সমীর চৌধুরী। সব ঘটনা পর্যালোচনা করে পুলিশের স্থির ধারণা জয়ন্ত বোসের হত্যাকারী ঐ নিরুদ্দিষ্ট ডাঃ সমীর চৌধুরীই।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল—পাঞ্জাবী যুবকটি ট্রেন উঠে পড়ল।

নিজের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে দেখে গুজরাটী ভদ্রলোক পুরুষোত্তম দাসই কেবল আছে—বাকী দু'জন যাত্রী পাটনায় নেমে গিয়েছে।

পুরুষোত্তমও গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঐদিনের সংবাদপত্রটা পড়ছিল।

পাঞ্জাবী যুবকটি একবার আড়চোখে দেখল—ডাঃ সমীর চৌধুরীর ব্যাপারটাই সে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছে।

পাঞ্জাবী যুবকটি তার সীটে বসল। সংবাদপত্রটা পড়তে লাগল। কিন্তু তার নজর ছিল পুরুষোত্তমের 'পরেই।

তার যেন মনে হলো পুরুষোত্তম মধ্যে মধ্যে আড়চোখে তাকেই লক্ষ্য করেছে থেকে থেকে।

পাঞ্জাবী যুবকটি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

তারপরই একসময় পাঞ্জাবী যুবকটির নজরে পড়ল, পুরুষোত্তম ঘন ঘন তার পার্শ্বে রক্ষিত অ্যাটাচীকেসটার দিকে তাকাচ্ছে।

নিজের অ্যাটাচীকেসটার দিকে তাকাল পাঞ্জাবী যুবকটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটার মধ্যে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে।

সর্বনাশ—অ্যাটাচীকেসটার উপর লেখা—ডাঃ এস. চৌধুরী।

ইস্—তাড়াহুড়োতে অ্যাটাচীকেসের উপরে লেখা নামটা তুলে ফেলতে তার মনে নেই।

বলাই বাহুল্য পাঞ্জাবী যুবকটি আর কেউ নয়—ডাঃ সমীর চৌধুরী।

রীতিমত একটা অস্বস্তি বোধ করে সমীর।

এখন উপায়—

নেকস্ট্ স্টপেজ এলাহাবাদ জংশন—

পুরুষোত্তম দাস হঠাৎ উঠে কম্পার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমীরও উঠে দাঁড়াল।

অ্যাটাচীকেসটা হাতে কম্পার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ল্যাভেটরীতে, চটপট বেশ বদলে ফেলল।

ফলস্ দাড়ি খুলে নুর দাড়ি লাগাল—সরু গোঁফ লাগাল।

চট্‌পট্ সুট বদলে—পায়জামা ও সেরওয়ানী পরল। অ্যাটাচী-কেসের গায়ে লেখা নামটা ঘষে ঘষে তুলে ফেলল একটা ছুরি দিয়ে।

প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে সম্পূর্ণ অন্য বেশে বের হলো সমীর ল্যাভেটরী থেকে।

এবারে পাঞ্জাবী যুবক নয়—

খানদানী এক মুসলমান যুবক।

—এলাহাবাদ বোধহয় এসে পড়ল।

করিডর ট্রেন—নিজের কম্পার্টমেণ্টে আর না গিয়ে করিডর দিয়ে সমীর গিয়ে ঢুকল রেস্টুরেণ্ট কারে।

সুটকেসটা পায়ের নীচে রেখে সমীর বসল একটা চেয়ারে ব্রেক-ফাস্ট-এর অর্ডার দিয়ে।

ট্রেন ছুটে চলেছে তখন এলাহাবাদের দিকে।

ধীরে ধীরে একসময় ট্রেনটা এলাহাবাদ স্টেশনে এসে ঢুকল।

রেস্টুরেণ্ট কারের জানালাপথে সমীর বাহিরে দৃষ্টি রাখে—হঠাৎ তার নজরে পড়ল পুরুষোত্তম আর একজন পুলিশ অফিসার তাদের কম্পার্টমেণ্টের দিকে চলেছে কি যেন কথা বলতে বলতে।

তাহলে তার অনুমান মিথ্যা নয়। পুরুষোত্তম তাকে সন্দেহ করেছে।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেনটা ঠিক ছাড়ার মুখে অ্যাটাচীকেসটা হাতে ঝুলিয়ে সমীর ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

না—পুলিশ অফিসারটি নামেনি—সম্ভবতঃ এখনো ট্রেনের সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এলাহাবাদেই ছুটো রাত একটা হোটেলে কাটিয়ে দিল সমীর জমীর খান পরিচয়ে।

নতুন একটা অ্যাটাচীকেস কিনে পুরানো অ্যাটাচীকেসটা ফেলে দিল।

এবার এলাহাবাদ ত্যাগ।

স্টেশনে এসে পৌঁছে সমীর জানতে পারল ডাউন ক্যালকাটা মেলটা আসতে খুব বেশী দেরি নেই।

আকাশে মেঘ করেছে—একটা অসহ্য গুমোট—বৃষ্টি নামবে হয়ত।

হোটেলের একটা বয়কে দিয়ে আগেই গয়া পর্যন্ত একটা টিকিট কাটিয়ে রেখেছিল সমীর ফার্স্ট ক্লাসের, সঙ্গে রিজার্ভেশনও।

ট্রেনেই বনোয়ারীলাল বাগলার সঙ্গে সমীরের পরিচয় হলো।

কাঠের ব্যবসায়ী—তরাই অঞ্চল থেকে বড় বড় গাছ কেটে বাগলা কলকাতায় চালান দেয়।

বনোয়ারীলাল লোকটার বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছিল কিন্তু কোন সন্তানাদি নেই—স্ত্রীও বছর তিনেক হলো মারা গিয়েছে।

হঠাৎ ট্রেনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে বনোয়ারীলাল।

যে কুপেতে সমীর রিজার্ভেশন পেয়েছিল তারই লোয়ার বার্থে ছিল বনোয়ারীলাল।

ট্রেনে উঠে সমীর দেখল প্রচণ্ড জ্বরে কাতরাচ্ছে বনোয়ারীলাল।

সে তার দেশ আজমীরে গিয়েছিল—সেখান থেকে কার্যস্থলে ফিরছে।

সমীরের অ্যাটাচীকেসের মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ছিল।

বনোয়ারীলালকে ঔষধ দিয়ে শুশ্রূষা করে অনেকটা সুস্থ করে তোলে।

নিজের পরিচয় দিল সমীর, সে লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে কিছুদিন আগে পাস করেছে—চাকরির সন্ধানে সে চলেছে গয়াতে, পরিচয় দিয়েছে রমাপ্রসাদ গুপ্তে বলে।

বনোয়ারী বললে, চলিয়ে না আমাদের তরাই অঞ্চলে—সেখানে ডাক্তার একেবারেই নেই। আমি সেখানে আপনার প্র্যাকটিশের সব ব্যবস্থা করে দেবো—চার পাঁচশ টাকা মাসে আপনার হেসে খেলে উপায় হবে।

সমীর দেখল মন্দ কি—কিছুদিন অন্ততঃ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে, অর্থ উপার্জনেরও একটা ব্যবস্থা হবে। ব্যাংকে টাকা থাকলেওত সে চেকে আপাততঃ টাকা তুলতে পারবে না।

চারিদিকে ঘন শাল জঙ্গল।

দুর্গম তরাই অঞ্চল।

বনোয়ারীলালের কাঠ চেরাইয়ের কারখানার অল্প দূরেই ছোট একটা বাংলোবাড়িতে সমীরের থাকার ব্যবস্থা হলো।

দূরে পাহাড়—একটা পার্বত্য নদীও আছে।

রাত্রে বন্যজন্তুর ডাক শোনা যায়।

লোকজনের বসতি কিছুটা দূরেই।

মাসখানেকের মধ্যেই সমীর সেখানে নিজের পসার করে নিল।

সবাই তাকে ভালবাসে।

রমাপ্রসাদ ডাক্তারের মত মানুষ নাকি হয় না।

মাস তিনেক বাদে হাজারখানেক টাকা সমীর কলকাতায় শ্যামলের নামে পাঠিয়ে দিল বনোয়ারীলালের ঠিকানা দিয়েই সীতার চিকিৎসার জন্য।

দিন পনের বাদে শ্যামলের চিঠি এলো: সীতা তার পূর্বস্মৃতি এখনো ফিরে পয়নি বটে তবে সে সুস্থই আছে। এখনো সে নার্সিং হোমেই চিকিৎসায় আছে। তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। পুলিশ এখনো তার সন্ধান করছে—

সীতা।

কতদিন তাকে দেখেনি সমীর।

যাক্ তবু একটা সান্ত্বনা, পূর্বস্মৃতি ফিরে না পেলেও সে সুস্থই আছে এবং নিরাপদেই আছে।

কিন্তু বেশীদিন থাকা হলো না সমীরের তরাই অঞ্চলে।

দীননাথ চক্রবর্তী জলপাইগুড়ির এস. পি.—এসেছিলেন জীপে করে তরাই অঞ্চলে শিকারে। মাইল দেড়েক দূরে সরকারী রেস্ট হাউস—সেখানেই উঠেছিলেন।

বনোয়ারীলালের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় তাঁর ছিল।

শিকারে এসে চক্রবর্তী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বনোয়ারীলাল সংবাদ পেয়ে তাঁকে দেখতে গেল এবং একজন লোক পাঠিয়ে দিল রমাপ্রসাদবেশী সমীরকে ডেকে আনতে।

দীননাথ যে এস. পি. সমীর জানত না। বনোয়ারীলালের ডাকে সে সোজা চলে এসেছিল রেস্ট হাউসে।

সমীরের মুখে যদিও দাড়ি ছিল—দাড়ি সে কাটত না—তবু দীননাথের সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হলো।

মুখটা যেন চেনা চেনা।

সমীর চলে যাবার পর নানাভাবে সমীর সম্পর্কে বনোয়ারীর কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁর সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো।

এবং তাঁর সন্দেহের কথাটা বনোয়ারীকে জানালেন।

সন্ধ্যায় বনোয়ারী সমীরের সঙ্গে তার বাংলোয় দেখা করতে এলো।

শীতকাল—

সমীর তার শোবার ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল।

ডাক্তার সাহেব আছেন নাকি?

কে! মিঃ বাগলা—আসুন আসুন—তারপর কেমন আছেন ভদ্রলোক?

ভাল। এস্. পি. সাহেব কি বলছিল জানেন?

কি?

আপনাকে নাকি এক পলাতক খুনী ডাক্তারের মত দেখতে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ—আমিত হেসে বাঁচি না। বললাম—এ কখনই হতে পারে না—আপনি ভুল করচেন—

সমীরের মনের মধ্যে কিন্তু চিন্তা দেখা দেয়—বিশেষ করে দীননাথের পরিচয় পেয়ে।

না—এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

সেই দিনই গভীর রাত্রে সমীর বের হয়ে পড়ল আবার নিরুদ্দেশের পথে।

মাসখানেক পরে হাজারিবাগ অঞ্চলে এক মিশনারী স্কুলের বাস ড্রাইভারের পরিচয়ে।

সরযূপ্রসাদ ড্রাইভার।

॥ বার ॥

মিশনারী স্কুলের রেকটার ফাদার জনসন।

যেমন শিক্ষিত তেমনি ধার্মিক মানুষটি—প্রথম যৌবনে সুদূর আয়ারল্যাণ্ড থেকে মিশনের কাজে এসেছিলেন ভারতে—আজ চল্লিশ বছর আছেন হাজারিবাগে।

মিশনের ছেলেদের নিয়ে ফাদার গিয়েছিলেন পিকনিকে।

সেখানে গিয়ে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার ব্রীজলাল—অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে—দীর্ঘদিন গাড়ি চালাচ্ছে বটে কিন্তু গাড়ির কলকব্জা সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নেই।

জনসন সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো—মিশনের স্কুলবাড়ি অনেক দূরে—সঙ্গে পনের জন নানা বয়েসী ছেলে—

ব্রীজলালও কি করবে বুঝতে পারে না।

দেহাতীর ছদ্মবেশে কাঁধে একটা ঝোলা ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে সমীর যাচ্ছিল—সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

কেয়া হুয়া সাব্? গাড়িকো কই গড়বড়ি?

জনসন বললেন, হ্যাঁ—গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না—

ম্যায় দেখ সকতে হুঁ।

গাড়ির কলকব্জা সম্পর্কে তুমি কিছু জান? জনসন প্রশ্ন করেন।

থোড়ি থোড়ি—

তব্ দেখো—

সমীর কিন্তু মিনিট পনেরর মধ্যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিল—ছেলের দল হইচই করে ওঠে।

কোথায় থাক তুমি? এদিকে কোথায় এসেছিলে—কি নাম তোমার? জনসন জিজ্ঞাসা করেন।

ফাদার জনসন ভারী খুশি।

বললেন, ইয়ংম্যান, কোথায় থাক তুমি, এই জংগলে কি করছিলে?

ঘুরতে ঘুরতে জংগলের মধ্যে এসে গিয়েছি।

কি নাম তোমার ইয়ংম্যান?

সরযূপ্রসাদ।

তুমি ত গাড়ির কাজ বেশ ভালই জান দেখছি সরযূ।

হ্যাঁ,—শিখেছিলাম কিছুদিন।

ড্রাইভিং জান?

জানি—কিন্তু লাইসেন্স নেই—

ডোণ্ট ওরি—লাইসেন্সের ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে—আমার কাছে কাজ করবে তুমি—

কিঁউ নেহি সাব্—কাজইত একটা খুঁজছি আমি—

বেশ—তবে চল আমার সঙ্গে—আমাদের ড্রাইভার ব্রীজলালের বয়েস হয়েছে আর বুড্ঢা—

কত মাইনা চাও—

যা দেবেন—

দেড়শ টাকা পাবে—খাওয়া থাকা—রাজী আছো?

ঠিক হ্যায়—

সমীর সরযূপ্রসাদ ড্রাইভার হয়ে কাজ নিল মিশন স্কুলে।

মাস তিনেক কাজ করবার পর চার দিনের ছুটি চাইল।

কোথায় যাবে? ফাদার শুধালেন?

মুলুক—সাব্—

জনসন সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন।

আসলে সমীরের মনটা ছটফট করছিল।

প্রায় দশমাস হলো সীতাকে সে দেখেনি—তরাই অঞ্চল ছাড়ার পর আর টাকাও পাঠাতে পারেনি—কিছু টাকাও ইতিমধ্যে জমেছে, শ'ছয়েক মত—সে টাকাটাও দিয়ে আসতে হবে—তাই ছুটি চেয়েছিল সমীর।

গভীর রাতে সমীর গিয়ে শ্যামলের নার্সিং হোমের দরজায় দাঁড়াল—

পরনে স্যুট—মাথায় টুপি—মুখে পাকা দাড়ি। হাতে একটা মোটা লাঠি।

বেল বাজাতেই দরোয়ান এসে দরজা খুলে দিল।

কি চাই ?

ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—বিশেষ জরুরী—

এত রাত্রে দেখা হবে না—ডাক্তার সাহেব এখন নিদ যাচ্ছেন—

মেহেরবানি করে তাঁকে একটা খবর দাও—বলো একটা খুব খারাপ রোগীর জন্য তাঁকে ডাকতে এসেছি—

দরোয়ান এবার আর আপত্তি করে না।

সমীরকে ওয়েটিং রুমে বসতে বলে সে তিনতলায় সংবাদ দিতে গেল।

শ্যামল ঘুমোচ্ছিল—দরোয়ান গিয়ে বলতে ভৃত্য তাকে ডেকে তুলে দিল।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে শ্যামল নেমে এলো নীচে।

কোথা থেকে আসচেন ? শ্যামল প্রশ্ন করে।

শ্যামল—আমি সমীর—

সমীর, তুমি—good god ! আমিত তোমায় প্রথমটায় চিনতেই পারিনি—বোস—বোস—

সমীর একটা চেয়ারে বসল।

শ্যামল!

য়্যাঁ—

সীতা কেমন আছে ভাই।

ভাল। অনেকটা progress করেছে, কিন্তু এভাবে তোমার এখানে আসাটা উচিৎ হয়নি সমীর—পুলিশ এখানে তোমাকে আর সীতাকে খুঁজছে। কোন মতে যদি জানতে পারে তুমি এ শহরে এসেছো—তোমাকেত arrest করবেই—সীতাকে নিয়েও হয়ত টানাটানি করবে—

জানি ভাই। সবই জানি—অনেক দিন তোমাকে কিছু পাঠাতে পারিনি—তাই ভাবলাম একবার খবরটা নিয়ে যাই—আর কিছু টাকাও তোমাকে দিয়ে যাই—এই নাও—

পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে সমীর শ্যামলের দিকে এগিয়ে ধরল—

টাকাটা নিতে নিতে শ্যামল বললে, তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই সমীর, খুব উপকার হলো ভাই এ সময়ে টাকাটা পেয়ে—দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী—এ নার্সিং হোম বোধহয় শেষ পর্যন্ত আমাকে তুলেই দিতে হবে—ভাবছি কেবল কনসালটেশন প্র্যাকটিস করবো—

তুলে দেবে?

কি করি বলো—খরচ চালাতে পারচি না। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন, বিলেত থেকে পড়ে এসে এই নার্সিং হোম খুলতেই সব প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে—

না শ্যামল—এমন একটা প্রতিষ্ঠান একে তুলে দিও না।

তুলে দিতে কি আমারই ইচ্ছা ভাই। যাকগে—তুমি আর এখানে থেকো না—একে সীতার জন্যে সর্বদাই আমার চিন্তা—

সীতাকে একবার দেখতে পারি শ্যামল?

না, না—

লক্ষ্মী ভাই—অনেকদিন তাকে দেখিনি—একটিবার চোখের দেখা—

বুঝলাম কিন্তু কোনক্রমে তোমাকে যদি কেউ সন্দেহ করে—তাহলে তুমিও বিপদে পড়বে আমিও পড়বো—

জানি—কিন্তু—

তাছাড়া এই রাত্রে—

একবার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে আসবো—

কি জানি কেন শ্যামল আর না বলতে পারে না। সমীরের গলার স্বর তার কাকুতি তাকে যেন বিচলিত করে তোলে।

বলে, বেশ—চল—

সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে উপরে উঠে এলো।

দোতলায় পর পর কেবিনগুলো। দুটি কেবিন খালি। দুটি কেবিনে পেসেণ্ট রয়েছে।

সিস্টার অন ডিউটিকে ডেকে শ্যামল বললে, সিস্টার, এঁকে ২নং কেবিনে নিয়ে যান—

কিন্তু পেসেণ্ট ত এখন ঘুমোচ্ছে!

উনি দেখেই চলে আসবেন। পেসেণ্টের আত্মীয়—

সিস্টার সমীরকে নিয়ে এগিয়ে গেল দু'নম্বর কেবিনের দিকে করিডোর দিয়ে।

দরজাটা ভেজান ছিল কেবিনের।

হাত দিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে সিস্টার বললে, Go inside but please don't disturb the patient.

সমীর ভিতরে ঢুকল।

মৃদু নীলাভ একটা আলো—রাত-আলো ঘরে জ্বলছে শয্যার পাশে।

সীতা শয্যায় শুয়ে—নিদ্রাভিভূত।

গলা পর্যন্ত একটা কম্বলে ঢাকা, মাথার রুক্ষ চুল বালিশে ছড়িয়ে রয়েছে।

সীতা। তার আদরের বোনটি। কতদিন—কতদিন পরে সমীর সীতাকে দেখছে।

ও যেন অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে।

সীতা—সীতা—

লোভ সামলাতে পারে না সমীর—আলগোছে একটা হাত সীতার মাথায় রাখে।

নীচু হয়ে তার ঠাণ্ডা কপালে একটা চুমো খায়।

সঙ্গে সঙ্গে সীতা জেগে ওঠে। চোখ মেলে তাকায়।

কে? কে?

আ—আমি—

কে—কে আপনি?

আমি একজন ডাক্তার। ভাল আছো?

হ্যাঁ—

ঘুমোও।

পারল না—সীতা তাকে আজো চিনতে পারল না।

সমীরের চোখদুটো জলে ভরে যায়।

সমীর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সমীর লক্ষ্য করেনি—হাওড়া স্টেশন থেকেই একজন পুলিশ অফিসার তাকে অনুসরণ করছিল।

জনার্দন বোস অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—তাঁর একমাত্র ছেলে জয়ন্তর হত্যাকারী এখনো ধরা পড়ল না।

সেন্ট্রাল পর্যন্ত তিনি নাড়াচাড়া করেছিলেন।

তখন সেন্ট্রাল থেকেই ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সুদক্ষ অফিসার চন্দন সিংকে ব্যাপারটা তদন্ত ও অনুসন্ধান করবার জন্য পাঠানো হয়।

দীর্ঘ দুই মাস ধরে নানাভাবে তদন্ত করে চন্দন সিংয়ের সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল জয়ন্তর হত্যাকারী আর কেউ নয় ঐ ডাঃ সমীর চৌধুরীই আর সেই কারণেই সে দুর্ঘটনার রাত্রি থেকে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে।

তার বোনেরও কোন সন্ধান নেই।

অনুসন্ধান কবতে করতে চন্দন সিং এলাহাবাদ হোটেল—তরাই অঞ্চলে বনোয়ারীলালের ওখানেও যায়—এবং সেখানে যে সব তথ্য সে পায় তাতে করে তার দৃঢ় ধারণা হয় রমাপ্রসাদ গুপ্তে লোকটা আর কেউ নয় পলাতক সমীরই।

তরাই অঞ্চল থেকে যে সে কোথায় গেল সেটা খুঁজে বের করতে বেশ কিছুদিন লাগে।

আরো একটা ব্যাপার চন্দন সিংকে ভাবিত করে তুলেছিল—যে যে জায়গায় সমীরের সন্ধান সে পেয়েছে কোথায়ও তার সঙ্গে কোন মেয়েছেলে ছিল না।

সে একাই।

সমীরের বোন সীতা তাহলে কোথায় গেল!

সমীরের যে দূর বা নিকট-আত্মীয়রা ছিল সেখানেও সে খোঁজ করেছে কিন্তু কোথাও সীতার কোন সন্ধান পায়নি।

সীতার ব্যাপারটাও রীতিমত রহস্যজনক।

সমীর ডাক্তারের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও দেখা করেছে চন্দন সিং কিন্তু কেউ তার কোন খবর দিতে পারেনি।

শ্যামল ডাক্তারের ওখানেও সে গিয়েছিল।

অনেক রাত হয়েছিল—বোধহয় রাত পৌনে বারটা।

শীতের রাত তাই রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছিল। পথের দু'ধারে কেবল আলোগুলো জ্বলছিল, স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মত।

মধ্যে মধ্যে দু'একটা ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ি যাতায়াত করছিল।

শ্যামলের নার্সিং হোম থেকে বের হয়ে সমীর হেঁটে চলেছিল হ্যারিসন রোডে যে ছোট হোটেলটায় সে উঠেছিল সেই হোটেলটার দিকে।

হঠাৎ সমীরের মনে হলো কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে।

জুতোর একটা শব্দ যেন তার পিছনে পিছনে আসছে।

সমীর প্রথমটায় অতটা খেয়াল করেনি কিন্তু শব্দটা ক্রমান্বয়ে তার কানে আসতে সে বোধহয় একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

পিছনে তাকাল সমীর। হঠাৎ মনে হলো যেন কে একজন চট্‌ করে একটা লাইটপোস্টের আড়ালে চলে গেল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলতে লাগাল সমীর—আবার সেই জুতোর শব্দ।

সমীর চট্‌ করে আবার একসময় পিছন ফিরে তাকাল—প্রায় হাত কুড়িক দূরে একটা লোক।

সামনে ও পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে—

লোকটাও দাঁড়িয়েছে তারই মত।

সমীর আবার হাঁটতে শুরু করল—স্পষ্ট বুঝতে পারল সমীর পিছনের সেই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও হাঁটা শুরু করেছে।

সমীরের আর কোন সন্দেহ থাকে না। লোকটা তাকে অনুসরণই করছে।

সমীর দ্রুত কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

ঘোরা রাস্তায় বেশ কিছুটা ঘুরে হোটেলের কাছাকাছি আসতেই সমীর চমকে উঠল—দু'জন লোক হোটেলের কাছে ঘোরাফেরা করছে আর অল্প দূরে একটা কালো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

সমীর মুহূর্তমাত্র আর দেরি করে না—

হোটেলের দিকে আর না এগিয়ে সমীর অন্য পথে এগিয়ে গেল।

দিন দুই পরে সন্ধ্যা নাগাদ—মিশনে ফিরে ফাদারের সঙ্গে দেখা করবে বলে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছে সমীর হঠাৎ নজরে পড়ল ফাদারের ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরের মধ্যে ফাদার ও একজন পুলিশ অফিসার।

সমীর বুঝতে পারল ঐ মিশনের বাসও তার উঠল।

ফাদারের ঘরে আর যাওয়া হলো না, সমীর আবার পথে নামল।

দিন দুই বাদে।

কলকাতাগামী রাঁচি এক্সপ্রেসের একটা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে একজন সাধারণ যাত্রীর বেশে সমীরকে দেখা গেল।

পরনে ধুতি—মেরজাই ও পাগড়ি মাথায় বিরাট একটি। ভারী একজোড়া গোঁফ।

মুড়ি জংশনে একজন পুলিশ অফিসার এসে তার কম্পার্টমেন্টে উঠল।

সমীর আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

ঐ লোকটিকেই সে দু'দিন আগে হাজারিবাগে মিশনে ফাদারের ঘরে বসে গল্প করতে দেখেছে—সমীর লোকটির পরিচয় যদি জানত—

পুলিশ অফিসার চন্দন সিং।

চন্দন সিং পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে—সমীর যেখানে বসেছিল সেই দিকেই।

কাছাকাছি আসতেই একটু সরে বলে, বৈঠিয়ে না সাব্—ইধার ত থোড়া জায়গা হ্যায়।

চন্দন সিং তাকাল সমীরের দিকে—

নেহি নেহি—ঠিক হ্যায়—চন্দন সিং বললে।

বৈঠিয়ে না—বহুৎ ঠাণ্ডি—

চন্দন সিং এবারে আর আপত্তি করল না, বসল সমীরের পাশে।

একটু পরে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল সমীর, সিগ্রেট পিজিয়ে সাব্—

চন্দন সিং একটা সিগ্রেট নিল।

সমীরই অগ্নিসংযোগ করিয়ে দিল।

বহুৎ ঠাণ্ডি—সমীর বললে।

হাঁ—চন্দন সিং সাড়া দিয়ে কামরার সর্বত্র তাকাতে থাকে।

কোই কিসিকো ঢুঁড়তে হে আপ সাব্—

য়্যাঁ—হাঁ—

কোই ডাকুওকু ?

হাঁ—

কোই বহুৎ বড়া ডাকু হ্যায় সাব্—

ডাকু নেহি খুনী।

আরে বাপ! ই কামরামে হ্যায় কেয়া ?

হো সেক্‌তা—

মুঝে ত বহুৎ ডর লাগতে হে সাব্—কেয়া নাম উসকো ? জেলসে ভাগা হুয়া কেয়া ?

চন্দন সিং আর উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেনটা একটা স্টেশনে এসে থামে।

সাব্—চায়ে পিয়োগে—সমীর শুধায়।

চায়ে—

হাঁ—লাউ—

লাইয়ে—

সমীর উঠে গিয়ে দু'ভাঁড় চা নিয়ে আসে—এক ভাঁড় নিজে নেয় অন্য ভাড় চন্দন সিংকে দেয়।

টাটানগরে ট্রেন থামলে সমীর নেমে যায়।

॥ তের ॥

তার পর থেকে তুটো মাস বোম্বাই ও নাগপুর অঞ্চলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি মাস্টারজী—চন্দন সিংয়ের তাড়া খেয়ে।

বলতে বলতে সমীর থামল।

শান্তাপ্রসাদ আর বন্দনা এতক্ষণ যেন পাথরের মত বসে সমীরের কাহিনী শুনছিল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—

ভোরের আবছা আলো জানালাপথে দেখা যায়।

সমীর বললে, কিন্তু এবারে আমি নিশ্চিন্ত মাস্টারজী, সীতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে—যে চিন্তাটা সর্বক্ষণ আমাকে অস্থির করে রেখেছিল তা আর রইলো না। এবারে সারেণ্ডার করবো পুলিশের হাতে—

বন্দনা বলে ওঠে, পুলিশের হাতে সারেণ্ডার করবেন ?

হ্যাঁ—

কিন্তু কেন ? বন্দনা শুধায়।

কেন ? আর এ জীবন সহ্য করতে পারচি না। এই যে কুকুরের মত তাড়া খেয়ে খেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান—I am tired—I am really sick of it.

কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা দিলে—

জানি বিচারে আমার ফাঁসি হবে। হত্যা করেছি একজনকে ফাঁসি হবে না—হবেই ত—

কিন্তু যে জন্য আপনি হত্যা করেছেন—

হত্যা হত্যাই—আচ্ছা মাস্টারজী ম্যায় চল রাহা হুঁ! এই রূপিয়া রাখিয়ে—

কয়েকটা নোট বের করল সমীর পকেট থেকে—

নেহি ডকটার সাব্—উসকে লিয়ে আপ ফিকার মত্ করিয়ে—যো করনা ম্যায় করুঙ্গা—

লেকেন মাস্টারজী—

নেহি মুঝে সরমিন্দা না করিয়ে—কিষণজী আপকো রকসা করেঙ্গে—

সমীর বের হয়ে এলো।

বনের পথই ধরেছিল সমীর—

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ পেয়ে সমীর ঘুরে তাকিয়ে অবাক হলো—বন্দনা।

একি আপনি—আপনি কোথায় চলেছেন ?

আপনার সঙ্গে—

আমার সঙ্গে ! কোথায় ?

যেখানে আপনি যাবেন।

এসব কি বলচেন আপনি ! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—যান যান ফিরে যান—

না।

মানে ?

মানে আবার কি যাবো না—

যাবেন না ?

না—আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবো—

অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত ?

হ্যাঁ—আপনার প্রতি যে অন্যায় করেছি—

আমার প্রতি আপনি আবার কি অন্যায় করলেন ?

করেছি, আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।

সমীর হেসে বললে, এখন বুঝি চিনে ফেলেছেন।

আপনিও আমাকে চেনেন আমিও আপনাকে চিনি এবং বহুদিন থেকেই—

সত্যি ?

বন্দনার নাম আপনি শোনেননি বলতে চান—আপনার পিতৃবন্ধু বম্বের বিখ্যাত ব্যারিস্টার—

আ—আপনি—

হ্যাঁ—তাঁরই মেয়ে আমি বন্দনা।

সমীর কয়েকটা মুহূর্ত চেয়ে থাকে বন্দনার মুখের দিকে।

আপনি বন্দনা ব্যানার্জী ?

হ্যাঁ—

ভোরের আলো তখন গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চারপাশে এসে পড়েছে।

কিন্তু আপনি কলকাতায় কেন যাচ্ছিলেন ?

সে অনেক কথা—কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—কোথায় যাবেন চলুন—

আমি ত যাচ্ছি পুলিশ স্টেশনে surrender করতে। আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন—

সত্যিই আপনি তাহলে সারেণ্ডার করবেন ?

হ্যাঁ—

তাহলে—আমার—আমার কি হবে ?

আপনি বম্বে ফিরে যান।

সে সম্ভব নয়।

কেন ?

সেখানে ব্রজদুলাল আছে।

সে আবার কে ?

মামা জোর করে তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল—

ওদের কথা শেষ হলো না—

ওদের চারপাশ থেকে একদল আর্মড পুলিশ ঘিরে ফেলেছে ততক্ষণে।

সমীরবাবু—হাত তুলুন—

সামনে দাঁড়িয়ে চন্দন সিং।

আমি থানাতেই যাচ্ছিলাম ইন্সপেকটার—ভালই হলো পথেই দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে—

চন্দন সিংয়ের ইঙ্গিতে একজন সেপাই এসে সমীরের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

বন্দনা দেবী, একটা অনুরোধ করে যাই—যদি সম্ভব হয় শ্যামলের সঙ্গে দেখা করে বলবেন ওদের বিয়েতে আমি খুব খুশী হয়েছি—আশীর্বাদ করচি ওরা সুখী হবে—

দেবী নয়—বন্দনা, বন্দনা বললে, তুমি কিছু ভেবো না সমীর—আমি বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার লাগাবো—বন্দনার চোখে জল আসে কথা বলতে বলতে।

ইন্সপেকটার—সমীর ডাকল।

ইয়েস—

ওঁকে আপনার লোক দিয়ে উনি যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেবেন।

ঠিক আছে—

চলুন তাহলে—

চন্দন সিং সমীর ও বন্দনাকে নিয়ে অগ্রসর হলো।

শীতের এক সকাল।

সীতাকে বিয়ের পরই ডাঃ শ্যামল রায়ের জীবনে অদ্ভুত এক যোগাযোগ ঘটেছিল।

অনেকদিন থেকে সে চেষ্টা করছিল সরকারী সাহায্যের জন্য—হঠাৎ সেটা মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ আসে।

এবং মাসখানেক বাদে সমস্ত বাড়িটাই একটা মেনটাল অ্যাসাই-লামে পরিণত করে সে বালিগঞ্জ অঞ্চলেই তিন-কামরাওয়ালা একটা ফ্ল্যাট দেখে স্ত্রী সীতাকে নিয়ে উঠে আসে।

সে রাত্রে সমীর চলে যাবার পর শ্যামলের একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছিল—সীতার জন্য সত্যিই সমীরের যেন চিন্তার অবধি নেই। এবং ভাইয়ের বোনের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসাটাও তাকে মুগ্ধ করেছিল।

কেন যেন সে তার বন্ধু সমীরকে প্রথম দিন থেকেই একজন খুনী হত্যাকারী বলে ভাবতে পারেনি।

যদি সমীর ঘটনাচক্রে জয়ন্তর হত্যাকারী হয়ও তাহলে সে কি খুব একটা অন্যায় কাজ করেছে! সমীরকে সে খুব ভাল করেই চিনত—আর ধনীপুত্র উচ্ছৃঙ্খল লম্পট জয়ন্তর কথাও সে জানত না এমন নয়।

জয়ন্তর দ্বারা সবই সম্ভব।

তারপর সীতাকে নিজের নার্সিং হোমে রেখে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করতে করতে কেমন যেন একটা ভালবাসাও জন্মে গিয়েছিল সীতার প্রতি তার।

সীতা আর সমীরের কথা চিন্তা করতে করতেই সীতাকে বিবাহ করার কথাটা তার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল।

একমাত্র সীতার পূর্বস্মৃতিটুকুই নেই—এক পক্ষে হয়ত সেটা তার প্রতি বিধাতার আশীর্বাদ।

তার দেহ ও মনের উপর দিয়ে যে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে অন্ততঃ সেটা ত সে স্মৃতিভ্রংশের জন্য ভুলে থাকতে পেরেছে।

সীতাকে সে যদি বিবাহ করে সমীর নিশ্চয়ই খুশি হবে।

সব কথা ভেবেই শ্যামল সীতাকে বিবাহ করেছিল।

হিন্দুমতেই বিবাহ করেছিল—ওদের পুরোনো চাকর শংকর উপস্থিত ছিল।

কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন সীতার এক দূরসম্পর্কীয় কাকা দীনেশ চৌধুরী।

সেই কাকা দীনেশ চৌধুরীর অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না, এবং সমীর বরাবর তাঁকে সাহায্য করেছে। কৃষ্ণনগরে থাকতেন।

শংকরের কাছেই তাঁর সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে তাঁকে সব কথা বলেছিল শ্যামল। এবং এও বলেছিল গোপনেই সে সীতাকে বিবাহ করতে চায়—নচেৎ ব্যাপারটা জানাজানি হলে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছিল সমীরই ঐ বিবাহ স্থির করেছিল—বিবাহটা হয়নি শুধু হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগে সীতার স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায়।

শ্যামল চায়ের টেবিলে বসে চা পান করছিল—সীতা শ্যামলকে চা পরিবেশন করছিল এমন সময় ভৃত্য ঐ দিনকার সংবাদপত্রটা এনে টেবিলের 'পরে রাখল।

সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় চোখ দিতেই শ্যামল চমকে ওঠে: সমীরের ছবি দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—মধ্যপ্রদেশের কোন এক জায়গায় সমীর ধরা পড়েছে। তাকে কলকাতায় আনা হবে—তারপর তার বিচার শুরু হবে।

সীতা।

কিছু বলচো?

আচ্ছা তোমার এক ভাই ছিল মনে পড়ে তোমার?

ভাই—

হ্যাঁ—আপন সহোদর ভাই—

আমার ভাই—

হ্যাঁ—দেখ তো এই ছবিটা—

সীতা ছবিটা দেখল কিন্তু তার চোখে মুখে কোন বৈলক্ষণ্যই প্রকাশ পায় না।

বল তো এ কে? কার ছবি?

কে?

চিনতে পারচো না?

না—আমার দাদা—একটু থেমে বললে সীতা!

হ্যাঁ—তোমার দাদা।

কোথায় আছে এখন?

শ্যামল সংবাদপত্রটা ততক্ষণে একদিকে সরিয়ে ফেলেছে—সীতা যদি পড়ে ফেলে সংবাদটা সেই ভয়ে।

আছে এখানেই—এই কলকাতাতেই—দেখা করবে তার সঙ্গে?

করবো—

বেশ। নিয়ে যাবো তোমাকে একদিন।

বন্দনা কিন্তু বোম্বাই যায়নি—

চলে এসেছিল কলকাতায়। মিঃ সিং তাকে কলকাতায় আসবারই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কলকাতায় এসে উঠেছিল তার বান্ধবী রাখীর বাড়িতে।

রাখীরা একসময় বোম্বাইয়ে ছিল দীর্ঘদিন।

রাখীর বাবা অমিয়নাথ সান্ন্যাল ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তখন।

মাস চারেক হলো রাখীর বাবা রিটায়ার করেছিলেন।

রাখী প্রায়ই বন্দনাকে লিখতো কলকাতায় একবার ঘুরে যাবার জন্য।

বন্দনাকে দেখে রাখী অত্যন্ত খুশি হয়—

সত্যি তুই এসেছিস্ বন্দনা!

হ্যাঁ—চল তোর ঘরে—

তোর জিনিসপত্র কোথায়?

চল ঘরে—অনেক কথা আছে।

রাখীর ঘরে বসে বন্দনা তার সমস্ত ইতিহাস ও সমীরের কথা বলে গেল।

বলিস কি! এ যে এক রীতিমত উপন্যাস রে! রাখী বললে।

তাই! শোন আমি তোর সাহায্য চাই—সমীরকে কলকাতায়ই পুলিশ নিয়ে আসবে—তারপর হয়ত তার বিচার শুরু হবে—আমি একজন ভাল ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেট দিয়ে তার মামলা চালাতে চাই—আমার নামে অনেক টাকা ব্যাংকে আছে—চেকবইও আমার সঙ্গে আছে—টাকার জন্য ভাবিস না—

তুই যে দেখচি সত্যিই মজেছিস বন্দনা। মৃদু হেসে রাখী বললে, কিন্তু—

কিন্তু কি?

সত্যিই যদি সে খুনী হয়—

না—বিশ্বাস করি না সমীর কাউকে খুন করতে পারে।

একেই বলে বোধহয় রে ভাগ্যের পরিহাস—

হয়ত তাই—নচেৎ কি বিচিত্রভাবেই না দু'জনার পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল—যাকে মনে মনে একপ্রকার বর্জন করেছিলাম—শেষ পর্যন্ত—

রাখী মৃদু হেসে বলে ওঠে, পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি—শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে—

রাখী তার বাবা অমিয়নাথ সান্যালকে ঐদিনই বন্দনার সব কথা বললে।

সব শুনে তিনি বললেন, বেশ কাল নিয়ে যাবো তোমার বান্ধবীকে অ্যাডভোকেট বরদাপ্রসন্নর কাছে—সে আমার বন্ধুও বটে দীর্ঘদিনের, ফৌজদারী মামলায় তার নামডাকও প্রচুর।

॥ চোদ্দ ॥

ঢুঁধে অ্যাডভোকেট বরদাপ্রসন্ন মল্লিক।

তিনি সব শুনে বললেন, ঠিক আছে—আমি খোঁজ নেবোখন সমীর চৌধুরীকে কলকাতায় আনা হয়েছে কিনা—তারপর তার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। তার মুখ থেকেও সব আমার শোনা প্রয়োজন।

বন্দনা বললে, কিন্তু কেসটা আপনাকে হাতে নিতে হবে মিঃ মল্লিক।

অমিয়র সঙ্গে যখন তুমি এসেছ মা আমার যথাসাধ্য আমি করবো—

দিন পাঁচেক বাদেই বরদাপ্রসন্ন খবর দিলেন সমীরকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে এনে রাখা হয়েছে।

সমীরের গ্রেপ্তারের সংবাদে সারাটা শহরে একটা হইচই পড়ে গিয়েছিল—বিশেষ করে চিকিৎসক মহলে।

কলকাতা শহরের উদীয়মান ডাক্তাররা সমীরকে বেশ ভাল করেই চিনত।

দেড় বছর পূর্বে তার সম্পর্কে যখন সংবাদপত্রে সংবাদটা প্রকাশিত হয়—সেই জনার্দন বোসের পুত্র জয়ন্ত বোসকে হত্যা করেছে—সবাই বিস্মিত হয়েছিল। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল—অনেকে বিশ্বাসও করেনি।

বিশেষ করে চিকিৎসক মহলে সমীরের যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

কিন্তু তারপর যখন জানা গেল সমীর ফেরার, তার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না তখন অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।

তবে কি সংবাদটা সত্যি? মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপারটা এমনই পলকা বুঝি।

মাস দেড়েক বাদে যখন সমীর চৌধুরীর মামলাটা আদালতে উঠল—শহরের সমস্ত সংবাদপত্রেই তা ফলাও করে ছাপা হলো।

সমীরকে কথা দিয়েছিল বন্দনা শ্যামলের সঙ্গে সে দেখা করবে। সেইমতই একদিন শ্যামলের নার্সিং হোমে তার চেম্বারে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

আপনাকে ত চিনতে পারচি না বন্দনা দেবী? কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—শ্যামল বললে।

বিশেষ দরকারেই দেখা করতে চেয়েছিলাম—বন্দনা জবাব দেয়।

কি ব্যাপার বলুন ত!

ডাঃ সমীর চৌধুরীকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই।

চিনি—সে আমার বিশেষ বন্ধু।

জানি। আর এও জানি সমীর তার বোন সীতাকে অসুস্থ অবস্থায় আপনার হাতেই চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়ে গিয়েছিল—

আপনি! আপনি সে কথা জানলেন কি করে?

জানি। আর এও জানি সীতাকে আপনি বিয়ে করেছেন—সমীর আপনাদের আশীর্বাদ পাঠিয়েছে।

সত্যি বলচেন?

হ্যাঁ—

আঃ আমার বুক থেকে এতদিনে একটা বোঝা নামল। কিন্তু আপনার পরিচয়টা ত এখনো পেলাম না—

আমি তার বাগ্‌দত্তা—

বাগ্‌দত্তা?

হ্যাঁ—আমার বাবা আর সমীরের বাবা বাল্যবন্ধু ছিলেন—তাঁরাই আমাদের বিবাহ স্থির করে যান। তারপরই একটু থেমে বন্দনা বললে, ডাঃ রায়, আমি জানি সমীর নির্দোষ—

আমারও তাই ধারণা, কিন্তু আইন—

আইনের সঙ্গে লড়বো। আপনারও সাহায্যের হয়ত প্রয়োজন হবে।

নিশ্চয়ই—এ ব্যাপারে আমার সব সাহায্যই আপনি পাবেন।

তারপর একটু থেমে বন্দনা বললে, আমি শংকরের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম—সেও বিশ্বাস করে না সমীর কাউকে হত্যা করতে পারে। সে যাক—সীতা এখন কেমন আছে ?

পূর্বস্মৃতি এখনো ফেরেনি—otherwise সে সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু একটা কথা—আপনি কি সমীরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

না—কাল করবো—আপনি দেখা করেছেন ?

আজ দেখা করবো—শ্যামল বললে।

দেখা হলো দুই বন্ধুতে জেলের মধ্যে।

সমীর বললে, শ্যামল, তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভাই—সব জেনে শুনেও তুমি সীতাকে বিবাহ করবে এ আমি ভাবতেও পারিনি ভাই—

ও কথা থাক সমীর। বন্দনা আজ এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে—তুমি কিছু ভেবো না—সে খুব নামী একজন অ্যাডভোকেট দিচ্ছে তোমার মামলা চালাবার জন্য—

কি হবে ভাই ওসব করে—

কি বলচো তুমি !

ঠিকই বলচি—আর যাই করি না কেন আদালতে সীতার নাম ত মুখেও আনতে পারবো না।

না, না—তা হলে যে সব কেঁচে যাবে !

তা যাক। সেই হতভাগিনী যার পূর্বস্মৃতি এখনো লুপ্ত—সব অন্ধকার—তাকে আমি কেমন করে আদালতের কাঠগড়ায় এনে দাঁড়

করাবো বলতে পারো শ্যামল—আর কোন্ মুখেই বা ভাই হয়ে তার চরম দুঃখের কথা আদালতে সবার সামনে বলবো! ছিঃ ছিঃ, তা হয় না—

ভাই বলে যা সত্য তাকে তুমি গোপন করে যাবে? তা তোমাকে কিছুতেই আমি করতে দেবো না জেনো সমীর—

বুঝতে পারচো না কেন শ্যামল, সে আজ তোমার স্ত্রী—

তাকে ত আমি সব জেনে শুনেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি ভাই!

শ্যামল—

হ্যাঁ সমীর আমি বিশ্বাস করি না দেহটা একটা কাচের পাত্র—সামান্য আঘাতেই সেটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু সমাজের কথাটা ত ভাববে—

নিশ্চয়ই ভাববো কিন্তু সমাজ যদি একটা ক্ষণিকের ভুলকেই বড় করে দেখে আর গোটা মানুষটাকে অস্বীকার করে সে সমাজকে আমি স্বীকার করি না—

কিন্তু নিজেকে যে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারচি না শ্যামল! যদি সীতার প্রতি আমার আর একটু সজাগ দৃষ্টি থাকতো তবে ত অতবড় বিপর্যয়টা ঘটতে পারতো না—

ওসব নিয়ে আর মনকে তুমি পীড়িত করো না সমীর। আর সীতা আজ আমার স্ত্রী—তার সকল দায়িত্বই আমার—

সীতা কেমন আছে ভাই?

ভাল।

তোমার মত স্বামী পেয়েছে যখন সে নিশ্চয়ই সুখী হবে। সুখী হও তোমরা—ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন—

সমীরের গলার স্বর বুজে এলো।

আমি এখন আসি সমীর—

এসো।

পরের দিন এলো বন্দনা, সঙ্গে বরদাপ্রসন্ন।

ছিঃ ছিঃ এখানে কেন তুমি এলে বন্দনা, সমীর বললে।

বন্দনা বললে, অন্যায় করেছি বুঝি ?

নিশ্চয়ই ! ভুলে যাচ্ছো কেন একটা জঘন্য খুনের অপরাধে আজ আমার বিচার হতে চলেছে !

সে ত মিথ্যা--

না, না—বন্দনা, মিথ্যা নয়—সত্যিই জয়ন্তকে আমিই খুন করেছি —বললে সমীর।

সে কথা আদালতই বিচার করবে ডক্টর চৌধুরী, বরদাপ্রসন্ন বললেন, এবার আপনি আমাকে সে রাত্রের প্রকৃত ঘটনাটা বলুন ত ! বন্দনা দেবী আমাকে আপনার হয়ে নিযুক্ত করেছেন—

আমাকে ক্ষমা করবেন—সত্য ঘটনা বলা মানেই আমার বোনকে আদালতে টেনে আনা—আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না—

এ আপনি কি বলচেন ডক্টর চৌধুরী—

আমার যা বলবার আমি বলেছি—

এর পরিণাম আপনি বুঝতে পারচেন !

কি আর হবে—ফাঁসি—এই ত—আর তা যদি নাই হয়—সাধারণের সমাজে আর ত আমার স্থান হবে না—চিরদিন দাগী হয়েই থাকতে হবে—তবে কেন আর নিজের মায়ের পেটের বোনের চরম দুঃখের কথাটা সবার সামনে উঁচু গলায় প্রকাশ করি ! না, যা হবার তা হোক—সব কলঙ্ক সব দুঃখ আমারই থাক—সীতাকে আর আদালতে আমি টেনে আনতে চাই না—

বন্দনা ও বরদাপ্রসন্ন অনেক বোঝালেন সমীরকে কিন্তু সমীরের সেই এক কথা—সীতাকে সে কোনমতেই আদালতে টেনে আনতে পারবে না।

বন্দনা শেষে বললে, সমীর, একটু ভেবে দেখো—

আমি ভেবেই যা স্থির করবার স্থির করেছি বন্দনা।

॥ পনের ॥

যথাসময়ে আদালতে মামলা উঠল।

আদালতগৃহ সেদিন বলতে গেলে যেন ভেঙ্গে পড়েছে। শহরের এক প্রখ্যাত নামী চিকিৎসক ডাঃ সমীর চৌধুরী আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়—হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামী।

জজ তাঁর আসনে সমাসীন—জুরিরাও যে যার আসনে সমাসীন।

আসামীর কাঠগড়ায় সমীর শান্ত—নির্লিপ্ত।

সরকার পক্ষের সুদক্ষ কৌন্সিলি প্রৌঢ় অমর বিশ্বাস সওয়াল করতে উঠলেন, মি লর্ড—আজকে যে হত্যা মামলার কথা আমি বলতে চলেছি তা সত্যিই বিচিত্র—হত্যাকারী—হ্যাঁ হত্যাকারী আজকের সমাজের এক অন্যতম সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি তাঁর প্রতিবেশী—শহরের প্রখ্যাত ধনী জনার্দন বোসের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত বোসকে আজ থেকে এক বছর তিন মাস আগে ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে জনার্দন বোসেরই বিরাম-কুটির নীলকুঠিতে এক অঝোর বৃষ্টিঝরা রাত্রে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে এতদিন পলাতক থাকবার পর ধরা পড়েছেন।

সমস্ত আদালত স্তব্ধ।

অমর বিশ্বাস বলে চললেন, কিন্তু হত্যার কারণ কি? কেন এই নৃশংস হত্যা? আমরা জানতে পেরেছি জয়ন্তর সঙ্গে হত্যাকারী ডাঃ সমীর চৌধুরীর বোন সীতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে—

সমীর সহসা চিৎকার করে ওঠে, মিথ্যা কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—জয়ন্ত বোস আমার বোনকে চিনতও না—

মিথ্যা যে নয় সে প্রমাণ অবশ্যই আদালতে পেশ করবো যথা-সময়ে—

সমীর আবার বলে ওঠে, না, না হুজুর—কোন প্রমাণের দরকার নেই! আমি স্বীকার করচি জয়ন্ত বোসকে সে রাত্রে আমি হত্যা করেছি—তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল—আমি তাকে ঘৃণা করতাম—তাই—তাই তাকে সে রাত্রে আমি হত্যা করেছিলাম।

সমস্ত আদালত গৃহ যেন সমীরের ঐ উক্তিতে স্তব্ধ হয়ে যায়।

হাজার জোড়া চোখের দৃষ্টি যেন সমীরের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ে। তারপরই একটা মৃদু গুঞ্জনে আদালতকক্ষ যেন মুখরিত হয়ে উঠল।

জজ সাহেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, অর্ডার—অর্ডার। ডক্টর চৌধুরী, আপনার যা বলবার পরে বলবেন—আদালত অবশ্যই শুনবে—proceed on মিঃ বিশ্বাস—

অমর বিশ্বাস আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ—আমাদের হাতে প্রমাণ আছে যে আসামীর বোন সীতা চৌধুরীর মৃত জয়ন্ত বোসের সঙ্গে কেবল ঘনিষ্ঠতাই ছিল না উভয়ের মধ্যে প্রেমও ছিল—

সমীর আবার চিৎকার করে উঠল, Lie—lie—It is a downright lie—মিথ্যা—

জজ আবার সমীরকে থামিয়ে দিলেন—অমর বিশ্বাস আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন, জয়ন্ত বিবাহ করতে চেয়েছিল সীতাকে কিন্তু সমীর চৌধুরী তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে—আর তাতেই মনোমালিন্যের সৃষ্টি—আর সেই মনোমালিন্যের জন্যই ক্রোধের বশে সমীর চৌধুরী সে রাত্রে বেচারী জয়ন্ত বোস যখন তাদের ব্যারাকপুরের বিরামকুটিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল সেখানে গিয়ে চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে—সেই হত্যার সাক্ষী বিরামকুটিরের কেয়ারটেকার নিতাইচন্দ্র—

অতঃপর নিতাইচন্দ্রকে ডাকা হলো—

সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলে গেল, সে রাত্রে তার মনিবপুত্র যখন বিরামকুটিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই সময় গাড়িতে চেপে

সমীর চৌধুরী সেখানে আসে—তারপর ঘরে গিয়ে ঢোকে যে ঘরে তার মনিব-পুত্র ছিলেন।

দুজনার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় তার বোনকে নিয়ে—সহসা একসময় পকেট থেকে পিস্তল বের করে সমীর চৌধুরী জয়ন্তবাবুর 'পরে গুলি চালায়—গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু পড়ে যান—তাঁর মৃত্যু হয় —সে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে থানায় খবর দেয়।

যাবার সময় সে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে যায়—কিন্তু সমীর চৌধুরী জানালার কাচ ভেঙ্গে পালায়—দারোগাবাবু আর তাকে দেখতে পান না—

দ্বিতীয় সাক্ষী স্থানীয় দোকানদার ভবতারণ পাড়ুই—সে সাক্ষী দিল সমীর চৌধুরী তার দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে নীলকুঠি কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিল—এবং সে সময় ভবতারণ তার হাতে পিস্তল দেখেছিল।

তৃতীয় সাক্ষী জয়ন্তর গাড়ির ড্রাইভার হরদয়াল। সে সাক্ষী দিল সমীর যখন গাড়িতে চেপে নীলকুঠিতে আসে সে তখন গাড়ির মধ্যে বৃষ্টির জন্য বসেছিল। সেও পিস্তলের আওয়াজ শুনেছে—জানালার কাচ ভাঙ্গার আওয়াজ শুনেছে, পালাতেও দেখেছে সমীরকে অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি নিয়ে।

সেদিনকার মত অতঃপর বিচার মুলতুবী রইল। আদালত বন্ধ হলো। মামলার তারিখ আরো চার দিন পরে পড়ল।

বরদাপ্রসন্ন বাড়িতে তার কনসালটিং চেম্বারে বসে—আলোচনা চলছিল—শ্যামল, বন্দনা আর শংকর।

বরদাপ্রসন্ন বলছিলেন, ওরা কৌশলে সীতাকে নীলকুঠিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছে—সেইভাবেই সাক্ষী সব তৈরি করেছে—মামলা সাজিয়েছে—কিন্তু সীতার ব্যাপারটা এ মামলায় বিশেষ important—আমাদের সেই pointয়েই এগুতে হবে—কিন্তু সমীরবাবু যেরকম adament হয়ে আছেন। বন্দনা দেবী—

বলুন!

আপনি আর একবার সমীরবাবুর সঙ্গে দেখা করুন। তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করুন—

করবো—কিন্তু সে তার বোনকে যেরকম ভালবাসে—রাজী করান যাবে বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু এভাবে সীতা দেবীর ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে চেপে যাওয়া will be rather suiciding! মামলা আমাদের রীতিমত দুর্বল হয়ে যাবে—আচ্ছা শ্যামলবাবু—

বলুন! শ্যামল তাকাল বরদাপ্রসন্নর মুখের দিকে।

আপনার স্ত্রী সীতা দেবীকে একবার সমীরবাবুর সামনে নিয়ে গেলে কেমন হয়—হয়ত তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরে আসতেও পারে—

পারে কিনা জানি না, তবে বলচেন যখন একবার চেষ্টা করে দেখবো।

দ্বিপ্রহরে সেই দিন আহারাদির পর শ্যামল সীতাকে পাশে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করছিল।

সীতা—

কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ—তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা করবে?

দাদা—

হ্যাঁ—বলছিলাম না সেদিন তোমার এক সহোদর ভাই আছেন যিনি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন—

সীতার চোখে মুখে কোন ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় না। সে যেন সংবাদটা শুনেও কেমন নির্লিপ্ত।

কি বলো একবার দেখা করবে?

না।

কেন ?

আমার কেন যেন এখনো মনে পড়চে না যে আমার এক দাদা আছেন—

আছে আছে, সত্যিই আছে।

তবে তিনি এতদিন আসেননি কেন ? আমাদের বিয়ের সময়ও আসেননি কেন ?

আসবেন কেমন করে—তিনি ত এখানে ছিলেন না—

তবে কোথায় ছিলেন ?

অনেক দূরে—আচ্ছা সত্যিই তোমার দাদাকে একটুও মনে পড়ে না ?

না।

শ্যামল উঠে গিয়ে সমীর আর সীতার একখানা ফটো যা সে শংকরের কাছ থেকে যোগাড় করেছিল দিন দুই আগে এনে সীতার সামনে ধরে বললে, দেখ—তোমার দাদা আর তুমি—

সীতা ফটোটা হাতে নিয়ে দেখল কিন্তু চোখে মুখে কোন আনন্দই প্রকাশ পায় না। কেমন যেন নির্লিপ্তভাবে ফটোটার দিকে চেয়ে থাকে।

পরের দিন আবার গেল বন্দনা জেলে সমীরের সঙ্গে দেখা করতে।

সমীর বললে, আবার তুমি কেন এলে বন্দনা—বুঝতে পারচো না কেন, এভাবে তোমার এখানে আসাটা ভাল নয়—

তুমি কেন সেদিন আদালতে ঐ কথা বললে ? এভাবে কেন নিজেকে সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছো ? ওরা একটা মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য কেন তা বুঝতে পারচো না—

উপায় নেই বন্দনা—উপায় নেই—একটা নিদারুণ আঘাত পেয়ে

সে তার পূর্বস্মৃতি হারিয়েছে—আদালতে এলে হয়ত নতুন করে আর একটা আঘাত পাবে—তার চাইতে এই ত ভাল—সে আজ সুখী—পূর্বস্মৃতি যদি তার জীবনে নাও ফিরে আসে অন্তত এটুকু ত জেনে যাবো আমার সীতা সুখে আছে—শ্যামলের কাছে সে সুখেই আছে—

আর আমি—আমার কথা একবারও কি তোমার মনে পড়ছে না ?

বন্দনা—

আমাকে বঞ্চিত করতে চাও তুমি কোন্ অধিকারে ?

বন্দনার দু'চোখে জল ভরে আসে।

বন্দনা—

কি ?

একটা কথা বলবো—মনে তুমি দুঃখ পাবে না ত ?

কি কথা ?

আমার কলঙ্ক—আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কেন তুমি নিজেকে জড়াচ্ছো এমন করে ?

সমীর—

ভুলে যাও আমাকে তুমি—অন্য কাউকে বিয়ে করে—

আর কিছু বলবার আছে তোমার ?

কেন তুমি বুঝতে পারচো না বন্দনা, আজ আমার পরিচয় তোমার কাছে শুধু দুঃখ আর লজ্জারই কারণ হবে—

আমি যাচ্ছি—

বন্দনা, রাগ করো না, শোন—

বন্দনা আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

॥ ষোল ॥

রাত্রের শোতে সেদিন শ্যামল সীতাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল।

ছ'জনে অন্ধকারে পাশাপাশি বসে ছবি দেখছে—ছবির মাঝামাঝি জায়গায় ছিল একটি দৃশ্য—একটি মেয়েকে ভুলিয়ে এনে একটি ছেলে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে—মেয়েটি প্রাণপণে বাধা দিয়েও পারছে না—

হঠাৎ অন্ধকারে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল দর্শকদের মধ্যে থেকে, না, না, না—জয়ন্ত না—

দর্শকজন সচকিত হয়ে ওঠে—শ্যামল তাড়াতাড়ি সীতাকে ধরে ফেলে—কিন্তু সীতা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছাড় ছাড়—আমাকে যেতে দাও—দাদাভাই—

গোলমাল—হইচই কি হলো? কি ব্যাপার?

শো বন্ধ হয়ে গেল—প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠল।

শ্যামল কিছুতেই সীতাকে ধরে রাখতে পারছে না—তখনও সীতা চেঁচাচ্ছে, আঃ ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—you brute—you dirty dog। Leave me leave me alone—

কামড়ে খিমচে শ্যামলকে সীতা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

কি? কি হয়েছে মশাই—

দর্শকরা ওদের ঘিরে ফেলে—

শ্যামলকে দর্শকরা এই মারে ত এই মারে—শ্যামল বহুকষ্টে উত্তেজিত দর্শকদের শান্ত করে বলে, শুনুন—শুনুন আপনারা—আমি একজন ডাক্তার—উনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী—ওঁর প্রচণ্ড একটা মানসিক আঘাতে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল—probably ছবির পর্দায় কিছু দেখে she has again come back to her senses.

সীতা তখনো হাঁপাচ্ছে—

শ্যামল এবার সীতার দিকে তাকিয়ে বললে, সীতা, আমি জয়ন্ত নই—দেখো—আমি শ্যামল—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—

সীতা বোধহয় শ্যামলকে চিনতে পারে—সে ধীরে ধীরে শান্ত হয় কিন্তু জ্ঞান হারায়—

শ্যামল তাকে বুকে করে নীচে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলে।

গাড়ির মধ্যেই সীতার জ্ঞান আবার ফিরে আসে।

কিন্তু সে কেমন যেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে যায়।

বাড়িতে এসে ঘুমের ঔষধ দিয়ে সীতাকে শয্যায় শুইয়ে দেয় শ্যামল।

পরের দিন বেলা সাতটা নাগাদ ঘুম ভাঙ্গল সীতার। চোখ মেলে তাকাল। শ্যামল পাশেই একটা চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়ছিল।

সীতা—

সীতা তাকাল শ্যামলের দিকে।

কেমন আছো এখন ?

সীতা কোন কথা বলে না।

শ্যামল এক কাপ কফি নিয়ে এলো, নাও এটা খাও—

সীতা জবাব দেয় না—সামনের আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ভেসে উঠছে সেই দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে।

এটা খাও—

তুমি আমাকে বিয়ে করেছো ?

হ্যাঁ—

কিন্তু তুমি জান না—জান না—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সীতা, জয়ন্ত —জয়ন্ত আমার—

সীতার মাথাটা বুকের 'পরে টেনে নিয়ে শ্যামল তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, ওসব কথা ভুলে যাও সীতা—

ভুলে যাবো কেমন করে?

তোমার দাদাভাইয়ের কথা ভাবো।

দাদাভাই? কোথায়—কোথায় সে?

আছে—দেখা করবে তার সঙ্গে?

না—

কেন—কেন দেখা করবে না? তোমার দাদাভাইয়ের ইচ্ছাতেই ত তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। যাবে দাদাভাইকে দেখতে—

দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নাঝরা গলায় সীতা বলে, ছিঃ ছিঃ, না, না—

দাদাভাই তোমাকে ডেকেছে—

ডেকেছে?

হ্যাঁ—শোন—জয়ন্ত মারা গেছে—

মারা গেছে—

সবাই বলছে—

কি বলছে?

তোমার দাদাভাইই নাকি তাকে গুলি করে মেরেছে—তোমার প্রতি সেরাত্রে জয়ন্ত—

সেকি! দাদাভাই ত সেরাত্রে সেখানে ছিল না—

সীতা, আমরা জানি তোমার দাদাভাই জয়ন্তকে গুলি করে মারেনি—কিন্তু পাছে তোমার দুর্নাম হয় বলে তোমার দাদাভাই তোমায় আদালতে একেবারে চেপে গিয়েছে—সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে টেনে—এখন একমাত্র তুমিই তাকে বাঁচাতে পারো—

আমি—

তুমি সব সত্য কথা আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে—পারবে না—

পারবো—নিশ্চয়ই পারবো—

দাদাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে?

হ্যাঁ করবো—কিন্তু—

কি ?

দাদাভাইয়ের কাছে এ মুখ দেখাবো কেমন করে ?

আমি ত তোমার সঙ্গে থাকবো।

পরের দিন জেলে।

শ্যামলের সঙ্গে সীতাকে দেখে সমীর বলে উঠল, ওকে—ওকে কেন এখানে আনলে শ্যামল! ছিঃ ছিঃ—

দাদাভাই—সীতা ডেকে ওঠে।

চমকে ওর দিকে তাকায় সমীর—

ওর পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে সমীর—শ্যামল বললে।

সত্যি—

দাদাভাই—এগিয়ে এলো গরাদের সামনে সীতা।

কি রে ?

দাদাভাই—তুমি আমাকে এখনো বকচো না কেন ?

বকবো—কেন রে ?

আমি জয়ন্তকে চিনতে পারিনি—তার কথায় বিশ্বাস করে—

জানি—জানি—আমার বোন কি এমন ভুল করতে পারে—আয় —আমার কাছে আয়—

সীতা আরো সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে গভীর মমতায় সমীর বোনের মাথাটা চেপে ধরে, সীতা—লক্ষ্মী বোন আমার—সুখে থাক তুই—সুখে থাক—শ্যামল বড় ভাল ছেলে—যাও শ্যামল ওকে এবারে এখান থেকে নিয়ে যাও—

আমি আদালতে সব সত্য কথা বলবো—সীতা বললে।

না, না সীতা—অমন কাজও করিসনে বোন—

শ্যামলের দিকে ফিরে সীতা বললে, চল—

সমীর চেঁচিয়ে ওঠে, সীতা শোন—শোন—

কিন্তু সীতা দাঁড়াল না—

আদালতে বরদাপ্রসন্ন তাঁর ক্রস শুরু করলেন সাক্ষীদের। প্রথম সাক্ষী নিতাইচন্দ্র।

নিতাইচন্দ্র তোমার নাম?

আজ্ঞে—

তুমিই নীলকুঠির কেয়ারটেকার?

আজ্ঞে—

সে রাত্রে তুমি ছিলে ত?

ছিলাম হুজুর।

সে রাত্রে তোমার দাদাবাবু নীলকুঠিতে একা গিয়েছিলেন? সঙ্গে আর কেউ যায়নি?

না—একা।

মিথ্যে কথা। একটি মেয়ে সঙ্গে ছিল—সত্যি বল—আদালতে মিথ্যা বললে কি শাস্তি জান ত! জেল হয়ে যাবে—

আজ্ঞে—

সত্যি বল—একটি মেয়ে ছিল সঙ্গে এবং প্রায়ই তিনি মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করতে সেখানে যেতেন।

আজ্ঞে হুজুর—সে রাত্রেও একজন ছিল—

সেই মেয়েটিকে নিয়ে তোমার দাদাবাবু ঘরের দরজা ভিতর থেকে আটকে দেন—কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি চেঁচামেচি শুরু করে—বাঁচাও বাঁচাও দাদাভাই বলে—তুমি সে চিৎকার শুনেও ভিতরে যাওনি—

না—

মি লর্ড—সে রাত্রে ডাঃ চৌধুরীর বোনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল জয়ন্ত বোস—তারপর তার ইজ্জতহানির চেষ্টা করায় সে

বাধা দেয়—এটা ঠিক সীতার সঙ্গে জয়ন্তর পরিচয় ছিল—কিন্তু সীতা জানত না জয়ন্ত কি চরিত্রের লোক—

অন্য পক্ষের অ্যাডভোকেট উঠে প্রতিবাদ জানালেন, Me Lord —it is an absolutely concocted story—

আদপেই তা নয়—বরদাপ্রসন্ন বললেন, প্রমাণ আমি দেবো—হুজুরের যদি অনুমতি হয় ত আমি আমার প্রধান সাক্ষী—এবং শুধু তাই নয় সে রাত্রের victimকে আদালতে সর্বসমক্ষে পেশ করতে পারি।

জজ অনুমতি দিলেন।

সীতা এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

হুজুর, এই সেই মহিলা, ডাঃ সমীর চৌধুরীর একমাত্র সহোদরা বোন সীতা দেবী—বর্তমানে প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ শ্যামল রায়ের স্ত্রী —উনি নিজমুখেই ওঁর দুর্গতির কথা সকলের সামনে পেশ করবেন—

সমীর চিৎকার করে ওঠে, সীতা—না, না—

সীতা ফিরেও তাকাল না তার ভাইয়ের দিকে—সে তার কাহিনী শুরু করল—

জয়ন্তর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। প্রায়ই আমরা এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম—সে বলেছিল আমায় বিবাহ করবে—কিন্তু তখন বুঝিনি তার অন্য মতলব ছিল—he was a dirty creature!

ঘটনার দিন বিকেলের দিকে—college ছুটি হবার পর সীতা কলেজ থেকে বের হয়ে এসে গেটের সামনে দেখল জয়ন্ত গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

সীতা—এসো—

কোথায়? সীতা মৃদু হেসে শুধায়।

চল না বেড়িয়ে আসি—

সীতা গাড়িতে উঠে বসল। সীতা তখনো জানতে পারেনি গাড়ির পিছনে আর একজন ঘাপটি মেরে বসেছিল—কপিল দত্ত।

গাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে যখন বি. টি. রোড ধরেছে ব্রিজ পার হয়ে—সীতা জিজ্ঞাসা করল, এদিকে কোথায় চলেছো?

চল না দক্ষিণেশ্বর—

কিন্তু বাড়িতে শংকরদা ভাববে। তাছাড়া দাদাকেও কিছু বলা নেই—

আর কতক্ষণই বা। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে যাবে।

আকাশে মেঘ জমা হচ্ছিল।

সীতা বললে, কি রকম মেঘ করছে—

ভালই ত, জয়ন্ত বললে, বৃষ্টির মধ্যে driving ভারি প্লেজেণ্ট ব্যাপার।

কিন্তু গাড়ি যখন দক্ষিণেশ্বরে যাবার রাস্তা বাঁয়ে না ঘুরে সোজা চলতে লাগল ডানলপ ব্রীজ পার হয়ে সীতা বলে, দক্ষিণেশ্বরে যাবে বলছিলে না—এদিকে কোথায় চলেছো—

চল না, একটা নতুন জায়গায় যাবো।

নতুন জায়গা?

হ্যাঁ—নীলকুঠিতে—

তোমাদের সেই বিরামকুটির—সে ত বলেছিলে ব্যারাকপুরে—

হ্যাঁ—সেখানেই—

না, না—please—আজ নয় অন্য একদিন—বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিতে দিতে জয়ন্ত বললে, কিছু দেরি হবে না—

না, ফেরো, দাদাভাই ভাববে—

ভাববে না—

এই জয়ন্ত কি হচ্ছে ফেরো—আজ যাবো না—

জয়ন্ত গাড়ির গতি তখন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে—

না, না—এই—সীতা জয়ন্তর স্টিয়ারিংয়ের উপরে রাখা হাতটা চেপে ধরে—এই জয়ন্ত—

Don't be silly সীতা—হলেই বা একটু রাত—কতদিন ত তুমি রাত করে ফেরো—

আজ শীলাকে সন্ধ্যায় চা খেতে বলেছি—সে হয়ত এতক্ষণ এসে বসে আছে—আজ নয়—লক্ষ্মীটি ফিরে চল—

ঠিক সেই সময়ই সীতার পিছন থেকে একটা রিভলভারের নল তার পিঠ স্পর্শ করে—ও চমকে ফিরে তাকায়, কে ?

কপিল দত্ত বলে, চুপটি করে বসে থাক। চেঁচিয়েছো কি গুলি করবো—

সীতা যেন বোবা।

॥ সতের ॥

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমেছে চারিদিকে।

জয়ন্ত সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে আসে নীলকুঠিতে। নির্জন নীলকুঠি।

গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত বলে, নেমে এসো সীতা—

না—আমি নামবো না—

নেমে এসো—

কপিল পিছন থেকে একটা ধাক্কা দেয় সীতাকে, নাম নইলে গুলি চালাবো—

সীতা কি ভেবে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

তিনজন এসে ঘরে ঢুকল।

নিতাইচন্দ্র ছুটে আসে।

নিতাই—

দাদাবাবু—

বাইরেটায় নজর রাখবি—চল সীতা—

জয়ন্ত—

ভিতরে চল—

তিনজনে ভিতরে ঢোকে। সন্ধ্যা নেমেছে চারিদিকে তখন। জয়ন্ত সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালায়।

কপিল, পিস্তলটা দেখি—জয়ন্ত বললে।

কপিল পিস্তলটা দিয়ে দিল।

Now you go out of this room—

বেরিয়ে যাবো ?

Yes !—জয়ন্ত বোস তার কোন কাজের সাক্ষী রাখে না—

জয়ন্ত—কি বলচো তুমি !

যা বলচি তাই করো—go out—

কপিলের চোখে আক্রোশ। তবু কপিল ফিরে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত কপিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়—একটা চিৎকার করে ঘরের বাইরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কপিল।

নিতাই—

দাদাবাবু—

ওটা ওখানেই পড়ে থাক—যাবার সময় ওটার ব্যবস্থা করবো।

সীতা চেয়ে চেয়ে সব দেখছে। জয়ন্ত ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল ভিতর থেকে—

জয়ন্ত আলমারি থেকে বোতল বের করে ঢক-ঢক করে খানিকটা নির্জলা মদই গলায় ঢেলে দেয়।

এসো সীতা—দূরে কেন !

সীতা নির্বাক। পাথর—

তোমার দাদাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তোমায় বিয়ে করবো—তা তিনি তাতে রাজী হলেন না। রাজী যখন হলেনই না তখন বিনা বিবাহেই আজ আমাদের বাসর রাত্রি—

সীতা নির্বাক।

কি হলো দাঁড়িয়ে কেন, এসো—

জয়ন্ত তুমি এত ইতর—

ইতর—হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে জয়ন্ত, তারপরই এগিয়ে আসে টলতে টলতে সীতার দিকে।

খবরদার বলচি এদিকে এগিয়ো না—

জড়িত গলায় জয়ন্ত বলে ওঠে, এগিয়ো না, না—না—না ওদিকে যেতে মানা সখি—

জয়ন্ত এগোয়—সীতা পিছু হাঁটে।

ধরতে গিয়েও ধরতে পারে না—চকিতে সীতা সরে যায়।

কত রঙ্গ আর দেখাবে সখি—

সীতা দরজার খিল খোলবার চেষ্টা করে—সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে জয়ন্ত সীতার উপরে, জাপটে ধরে তাকে—

ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

দু'জনে জাপটাজাপটি শুরু হয়। জয়ন্তকে কামড়ে খিমচে বাঘিনীর মতই যেন ফুঁসতে থাকে সীতা—

তবে রে হারামজাদী—জয়ন্ত সীতাকে জাপটে ধরে খাটের উপর নিয়ে ফেলল।

তার পরিধেয় শাড়ি আলগা হয়ে খুলে যায়—গায়ের জামা ছিঁড়ে যায়—চিৎকার করতে থাকে সীতা, বাঁচাও—বাঁচাও—দাদাভাই—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সীতা আর পারে না, এলিয়ে পড়তে থাকে ক্রমশঃ।

তারপর—তারপর আর আমার কিছু মনে নেই—কিছু মনে নেই—সীতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

বরদাপ্রসন্ন বলেন—আসামী সীতা দেবীর দাদা সমীর চৌধুরী ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন বোনের খোঁজে সংবাদ নিয়ে নিয়ে—এবং সে রাত্রে কি ঘটেছিল তার পরের ঘটনা বলবে আমার দ্বিতীয় সাক্ষী কপিল দত্ত—সে রাত্রে জয়ন্তর সে সঙ্গী ছিল।

কপিল দত্ত এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল ক্রাচে ভর দিয়ে দিয়ে—

কপিল দত্তের কোমরে ডান দিকে গুলি লেগেছিল—কিন্তু সে মৃত্যুর ভান করে পড়ে থাকে মাটিতে—জয়ন্তও ভাবে বুঝি কপিল মারাই গিয়েছে।

পাশের ঘরে ফোন আছে কপিল জানত। দরজা বন্ধ হতেই সে ঘেঁষটে ঘেঁষটে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং সমীরকে ফোন করে দেয়।

যন্ত্রণায় সে তখন অস্থির। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান ফেরে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে অনেকক্ষণ পরে। কপিল কোনমতে বাইরে আসে—বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যায়, দেখতে পায় সমীর গাড়ি থেকে নামছে—

সমীর দরজা বন্ধ দেখে এবং অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও দরজা না খুলতে পেরে অন্যদিককার বারান্দায় ছুটে যায়।

ঘরের জানালায় কাচের সার্সী ছিল কিন্তু কোন গ্রিলস বা রড ছিল না—সেই কাচের জানালাপথেই সমীর দেখতে পায় প্রায় চেতনাহীন সীতাকে রেপ করছে জয়ন্ত—

সমীর সেই সময় কাচের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জয়ন্ত ও সমীরের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। জয়ন্ত গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু সমীর পিস্তলটা তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

ঐভাবে ধস্তাধস্তি করতে করতেই একসময় সমীরের হাতের রিভলভার থেকে গুলি বের হয়ে যায়। আমি তখনো জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে—কপিল দত্ত বলতে থাকে, জয়ন্তকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছি—সমীরকে আমি গুলি চালাতে দেখিনি—তবে কি করে যে গুলি ছুটল তাও বলতে পারি না—

তারপর ? বরদাপ্রসন্ন প্রশ্ন করলেন।

তারপর আমি কোনমতে রক্তাক্ত অবস্থায় নীলকুঠি থেকে বের হয়ে আসি। একটা রিক্‌শা নিয়ে কোনমতে স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠি। সোদপুরে আমার বোনের বাড়ি—সেখানে যাই—তারাই আমার চিকিৎসা করায়। দীর্ঘ দুই মাস বাদে সুস্থ হলাম কিন্তু বাঁ পাটা অকর্মণ্য হয়ে গেল।

একটু থেমে আবার কপিল বলল, সংবাদপত্রে সমীরের বিচারের সংবাদ পড়ে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি কিন্তু সাহস হয় না আদালতে

এসে সব কথা বলতে—কারণ আমিও যে জয়ন্তর সঙ্গী ছিলাম সে রাত্রে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম আদালতে এসে আমার সব কথা প্রকাশ করা উচিত, নচেৎ এক নির্দোষীর প্রাণদণ্ড হয়ে যাবে—তখুনি আমি বরদাবাবুর সঙ্গে দেখা করে সে রাত্রের সব কথা তাঁকে জানাই। হুজুর, আমিও দোষী—আমার যা শাস্তি প্রাপ্য আমি মাথা পেতেই নেবো—তবু একজন নির্দোষী যেন শাস্তি না পায়।

বরদাপ্রসন্ন তাঁর শেষ সওয়াল করতে উঠলেন।

মি লর্ড ও জেণ্টলমেন অব দি জুরি, সেই দুর্যোগের রাত্রে সত্যি কি ঘটেছিল এবং কিভাবে জয়ন্ত বোসের মৃত্যু হয়েছিল সবই আপনারা শুনেছেন।

এক চরিত্রহীন লম্পট ধনীপুত্র কিভাবে একটি ভদ্র কুমারীর বিশ্বাস ও ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার প্রতি চরম অত্যাচার করেছিল ব্যারাকপুরের নীলকুঠিতে নিয়ে গিয়ে তাও শুনেছেন—এবং যার ফলে সীতা দেবীর স্মৃতিভ্রংশ হয়।

এও শুনেছেন কিভাবে তাঁকে ডাঃ শ্যামল রায় ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলেন।

ডাঃ সমীর চৌধুরী জয়ন্ত বোসকে হত্যা করেননি—যদিও enough provocation there was during the struggle—সমীর ছিনিয়ে নেন জয়ন্তর হাত থেকে গুলিভরা পিস্তলটি এবং accidentally struggleয়ের সময় গুলি ছুটে যায়—যে গুলি জয়ন্তকে বিদ্ধ করে তার মৃত্যু ঘটায়। সবটাই একটা accident ছাড়া আমি কিছু বলবো না, বলতে পারি না।

আশা করি আদালত সুবিচার করবেন।

জজ জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে ডাঃ সমীর চৌধুরীকে মুক্তি দিলেন সসম্মানে।

আদালত প্রাঙ্গণে সমীর এসে দাঁড়াতেই সীতা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরল—

দাদাভাই—

অদূরে দাঁড়িয়ে বন্দনা—শান্তাপ্রসাদ—বাবুয়া—বরদাপ্রসন্ন—শংকর—শ্যামল রায়।

সকলেরই চোখে জল।

॥ শেষ ॥